বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তজিহ্বা	২২৩
সপ্তলোক	২২৩
সপ্তসমুদ্র	২২৩
সপ্তস্বর	২২৩
সপ্তদ্বীপ	২২৩
স্ফোট্	৩০
সুষুপ্তি	২১৮
সপ্তপাতাল	২২৩

—●—

নাতন ধর্ম-দীপিকা

শ্রীভবতোষ আয়কাত

॥ সনাতন ধর্ম্ম-দীপিকা ॥

"আমার পরমআরাধ্য গুরুদেব ৺শ্রীমৎ **শ্রীমাধবানন্দ গিরী** মহারাজের পবিত্র নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।"

——শ্রীভবতোষ আয়কাত

প্রকাশক :—
শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী
শ্রীগুরুকুঞ্জ, শিবতলা রোড
হুগলী

প্রথম প্রকাশ
গুরুপূর্ণিমা,
২৭শে আষাঢ়, ১৩৮৩
১১ই জুলাই, ১৯৭৬

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপালচন্দ্র দাশ
শ্রীগুরু প্রেস,
শিজদা, মেদিনীপুর

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেদ	১
উপনিষদ্	১৬
উপনিষদের সারকথা	২৪
জীব	২৬
প্রণবমন্ত্র ওঁ	২৯
স্ফোট্	৩০
মুক্তি	৩১
গায়ত্রী মন্ত্র	৩২
মায়া ও ত্রিগুণ	৩৩
কপিল সাংখ্য দর্শন	৩৪
ঋগ্বেদে সোম	৩৯
স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র	৪১
রামায়ণ	৪২
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ	৪৫
অধ্যাত্ম রামায়ণ	৪৫
তুলসীদাস রচিত রামায়ণ	৫০
মহাভারত	৬১
অবতার	৮০
কর্ম্মফল	৮১
শ্রীমদ্ভাগবত	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য	১০৪
তন্ত্র	১২৯
গীতা	১৩১
অদৃষ্ট	১৫২
সন্ন্যাস	১৫২
ব্রহ্মবিচার	১৫৮
ত্রিগুণ	১৫৯
ধ্রুবনীতি	১৬০
পঞ্চযজ্ঞ	১৬০
ঈশ্বর উপাসনা	১৬১
দর্শন	১৬২
হিন্দুশাস্ত্র ও অধুনা সমাজ	১৬৫
সৎপথ	১৬৬
বোধ স্বরূপ	১৬৭
সূক্ষ্মদেহ	১৬৯
ভালমন্দ-পাপী-পাপাত্মা	১৬৯
প্রণবের তিন অংশ	১৭০
ঈশ্বর তত্ত্ব	১৭১
কুণ্ডলিনী	১৭৪
ধারণা	১৭৮
মহাজ্ঞান	১৮০
প্রারব্ধ (১)	১৮৩
তুরীয় ও তুরীয়াতীত অবস্থা	১৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুভয়	১৮৭
জপাৎসিদ্ধি	১৮৯
কুণ্ডলিনী ও যোগ	১৮৯
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা	১৯১
অন্নময় ও প্রাণময়কোষ	১৯৪
প্রাণায়াম	১৯৫
প্রারব্ধ (২)	১৯৫
জীবাবর্ত্ত	১৯৬
জ্ঞান	১৯৭
গুরু শিষ্য প্রসঙ্গ	১৯৭
সপ্তভূমি ও ষট্‌চক্র	১৯৯
সৃষ্টিতে নিয়ম	২০০
সংসারী ও অধ্যাত্ম জগৎ	২০৩
বৈষ্ণব সম্প্রদায়	২০৭
বিভূতি	২০৮
পাশ	২০৮
দান	২০৮
বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও রাসপঞ্চাধ্যায়	২০৯
বৈষ্ণব সাহিত্য	২১৪
নির্ব্বিকল্প সমাধি	২১৬
তুলসী মাহাত্ম্য	২১৮
মহাবাক্য	২২২
পঞ্চকোষ	২২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তজিহ্বা	২২৩
সপ্তলোক	২২৩
সপ্তসমুদ্র	২২৩
সপ্তস্বর	২২৩
সপ্তপাতাল	২২৩
সপ্তদ্বীপ	২২৩
মৃত্যুরপর	২২৩
ভগবান	২২৪
ষড়্‌বিধ ধর্ম্ম (বিকার)	২২৪
সমাধি	২২৪
জ্ঞান ও বিজ্ঞান	২২৪
পঞ্চদশী	২২৫
পরস্পর বিরোধিনী স্মৃতি ও শ্রুতি	[illegible]
বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম	[illegible]

—•—

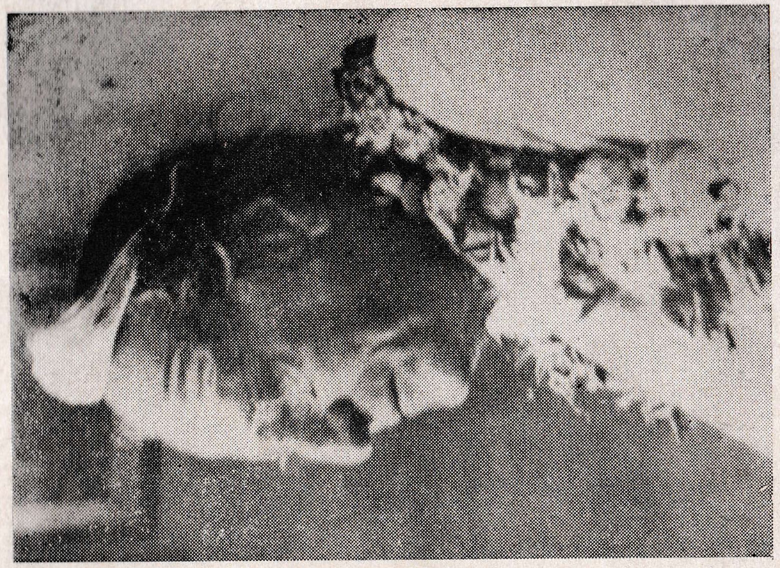

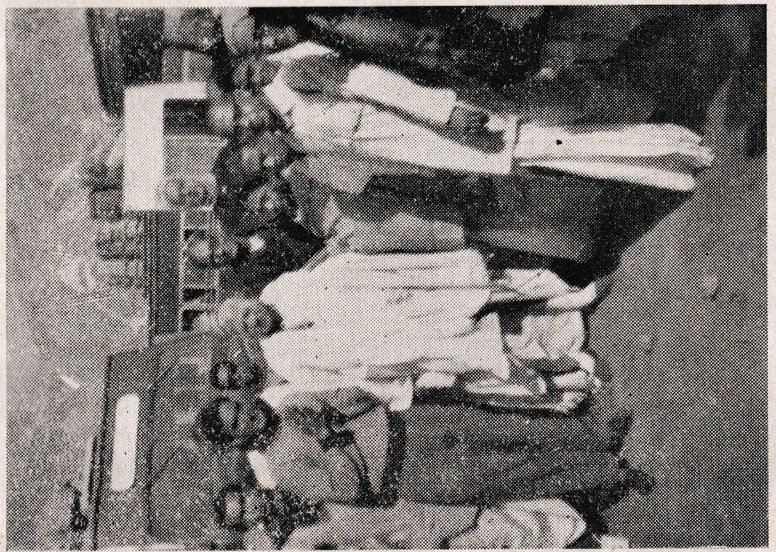

"বদ্রিনাথ হইতে ফিরিবার সময়
শ্রীশ্রী গুরুদেব ও কয়েকজন ভক্ত"

॥ প্রস্তাবনা ॥

সংক্ষিপ্ত হিন্দু শাস্ত্র

ভবসাগর—তারণ—কারণ হে
রবি—নন্দন—বন্ধন—খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ॥

শ্রীশ্রীমৎ মাধবানন্দ গিরি গুরু মহারাজের
শ্রীচরণে সহস্র কোটি প্রণাম নিবেদন করি।

যেদিন এই সংক্ষিপ্ত হিন্দুশাস্ত্র লিখিতে আরম্ভ করি, সেদিন ভাবি নাই যে ইহা শেষ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহার অশেষ কৃপায় অতি অল্প সময়ের ভিতর নিজের তৃপ্তিমত সব কিছুই লিখিয়া শেষ করিয়াছি। যখন পড়িয়াছিলাম তখন অনেক কিছু ভাসা-ভাসা ভাবে বুঝিয়াছিলাম। লিখিবার সময় আমার বুঝার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়িল। এখন বুঝিতেছি সবই তাঁহারই ইচ্ছা। সেই সদ্‌গুরুর শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

হিন্দুশাস্ত্রের অনেক কিছুই পড়িয়াছি। বুঝিবার চেষ্টাও করিয়াছি। তাহার ভিতর যতগুলি আমাদের প্রয়োজন মনে করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে ইহাতে লিখিলাম। ইহাতে আমার নিজস্ব বা নিজের কেরামতি কিছুই নাই। যেখানে যাহা ভাল পাইয়াছি, লিখিয়াছি। অগাধ হিন্দুশাস্ত্র সকলের পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। অথচ অনেকেরই ইচ্ছা হয়, হিন্দুশাস্ত্রে কি আছে জানিবার। এরূপ কোনও একটি পুস্তক নাই যাহা পড়িলে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে

সাধারণভাবে অনেক কিছু জানা যাইবে। আমি এই পুস্তকে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রকে পরের পর একত্র করিয়া সংক্ষেপে লিখিলাম। যাঁহারা বিশেষভাবে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহার সন্ধানও এই পুস্তকে পাইবেন। অভিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণীদের লেখা হিন্দুশাস্ত্রের নানা পুস্তকের সন্ধানও দিয়াছি।

প্রথম ভাগে পাঠকদিগকে শাস্ত্রসমূহ সাধারণভাবে অবগত করাইয়া ক্রমে শাস্ত্রের গুহ্য ব্যাপারগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এই পুস্তকের আদ্যপ্রান্ত পড়িলে হিন্দুশাস্ত্রের একটা সাধারণ জ্ঞান হইবে আশা করি। ইহা সাধারণের জন্য লেখা, শাস্ত্রজ্ঞদের জন্য নহে।

হুগলীর শ্রদ্ধেয় শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্নেহবশতঃ লেখাটি ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে প্রসঙ্গটি তাঁহারই লেখা। তাঁহারই প্রেরণাতে এই পুস্তক ছাপাইতে সাহসী হইয়াছি। তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এই পুস্তক ছাপান সম্ভব হইত না। সেইজন্য তাঁহার নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ আছি।

নিজের স্ত্রীর গুণগান করা খুবই অশোভন। কিন্তু যতই অশোভন হউক, এই পুস্তক লেখায় যদি আমি আমার স্ত্রী অরুণা-দেবীর ঋণ স্বীকার না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় করিব। আমার জীবনের যাহা কিছু সবই তাঁহার সাহায্যে। ঐ ধর্ম্মপ্রাণা নারী আমায় সতত সৎপথে চলিতে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণা ব্যতীত আমার পক্ষে এই পুস্তক লেখা সম্ভব হইত না।

শ্রীমৎ শ্রীমাধবানন্দ গিরি সম্বন্ধে প্রবন্ধ

শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী

পরমারাধ্য পরিব্রাজকাচার্য পরমহংস শ্রীশ্রী ১০০৮ স্বামী মাধবানন্দ গিরি (মৌনী বাবা) মহারাজের প্রিয় শিষ্য ও আমার সোদর-প্রতিম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত ভবতোষ আয়কাত জামসেদপুরের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, পাবলিক প্রসিকিউ-টার, টাটার লিগ্যাল এড্ভাইসার, রোটারীর প্রেসিডেণ্ট, নোটারী পাবলিক্ প্রভৃতি বহু উপাধিবিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী প্রবাসী বাঙ্গালী। তিনি বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং শ্রীগুরুর প্রেরণায় হিন্দু ধর্মের দর্পণস্বরূপ এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের ভক্তদের জন্য তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তজ্জন্য তিনি স্নেহবশতঃ উহার গুরু দায়িত্ব এই অপাত্রে অর্পণ করে আমাকে অত্যন্ত চিন্তিত করেছেন। আমার কতটুকু ক্ষমতা তা আমি বুঝি। তাই মহাভাবিত হ'য়ে যাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, সর্বপ্রথমে তাঁর শ্রীচরণেই শরণাগতি নিলাম।

"পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েশ্রুতিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্॥"
"ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি পুত্রম্।
শরণামন্যং যদহং ন জানে॥" জয়গুরু!

অবশ্য এই মহান্ কার্যে ব্রতী হওয়ায় আমি আপনাকে ধন্য ও পরম ভাগ্যবান্ মনে করি। যেটুকু তাঁর বিষয় তাঁর প্রেরণায় লিখছি, তাকে ঠিক "জীবনী" বলা যায় না। আমার তাঁর সাথে

সুদীর্ঘকালের সঙ্গের কিছু "স্মৃতিচারণা" এই প্রবন্ধের অভিধান হ'তে পারে।

এই মহতো মহীয়ান্ মহাপুরুষ অহেতুকী কৃপা করে কিঞ্চিদধিক বত্রিশ বৎসর যাবৎ তাঁর দুর্লভ ও পরম পবিত্র সঙ্গ অতি ঘনিষ্ঠভাবে এই অধম অকৃতী সন্তানকে দান ক'রে ধন্য করেছিলেন। একথা ভবতোষ দাদা জানেন বলেই বোধ হয় ইচ্ছা করেছেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমি যেন সকলের জন্য তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করি। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আমাদের পরমপ্রিয় গুরুগতপ্রাণ ৺বিজয় দাদা গাইতেন— "ধরা যদি নাহি দিবে, তবে কেন মন মাতাইলে?" প্রভুর শ্রীমুখ থেকে আমার স্বকর্ণে শোনা কথার বেশী প্রমাণ নাই। তবে অনেক অনেক বিষয় হয়তো আমার জানা ছিল না এবং নাইও। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে কিছু কিছু শোনার পর সেগুলিও আমি প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করেছি। তার থেকে যতটুকু সেই মহাপুরুষের অত্যাশ্রমিক ও তৎপূর্বজীবনী বিশ্বাস করি, ততটুকুই তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে ভয়ে ভয়ে লিখতে বসেছি। এই লেখনীতে তুমি স্বয়ং অধিষ্ঠিত হ'য়ে লেখাও প্রভু! এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীস্বামিজীর জীবনের অলৌকিক ঘটনা, বিভূতি ও ঐশ্বর্য প্রকাশ তাঁর কৃপায় অনেক দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সব বর্ণনা করা আমার ইচ্ছা নাই। আর তাঁর মহিমা আমার মত ক্ষুদ্র বিষয়াসক্ত জীব কেমন করে ও কতটুকুই বা বলতে পারে?

আজ থেকে বত্রিশ বৎসর পূর্বে হুগলীতে মহেশতলা পল্লীস্থ শ্রদ্ধেয় ৺বিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে তাঁর [illegible] দর্শন হয়। তখন জানলাম ইনি মৌনী সাধু এবং 'মৌনীবা[illegible]' বলেই

খ্যাত। জানু বিলম্বিত গৈরিক আলখাল্লা ও গৈরিকবস্ত্র পরিহিত সুঠাম মূর্ত্তি, গলায় রুদ্রাক্ষ ও গুঞ্জামালার সজনি, ললাটে চন্দনের ত্রিপুণ্ডক ও শ্রীমুখে বিভূতি ভূষিত, চোখ দুটি বিশেষ আকর্ষণীয় —যেন প্রেমে ডগমগ-মস্তকে সুন্দর কেশরাজি, গুম্ফ ও শ্মশ্রু কামান।

হরিপদ বাবুর (৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ছিলেন) হাতে একখানি কাগজে কি লিখিয়া দিলেন। তিনি সেই কাগজে লেখা সংস্কৃত শ্লোক পড়ে তার সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা করলেন। এইরূপে কয়েকটি লেখা শ্লোকেরই ব্যাখ্যা করলেন। হরিপদ বাবু শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে অনেকদিন ধ'রে তাঁর লিখিত শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করতেন। শ্রীশ্রীবাবা শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধুত্তম ছিলেন। তাঁর লিখিত শ্লোকাদির ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে আমি যাঁদের দেখেছি তাঁদের নাম— ৺মাখনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জনৈক অন্ধ কবিরাজ ৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ৺ডাক্তার সনৎকুমার ঘোষ, ৺গণেন্দ্র দাদা, ৺(ডাঃ) নলিনী ব্রহ্ম, এম্. এ. পি. আর. এস্. ও ৺মোহরলাল সিংহ। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধু বাবার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে অন্ধ কবিরাজ গত হলে এঁদের সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে তাঁর লিখিত শ্লোকাদির ব্যাখ্যার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। শেষে আমি ও মোহর দাদা রইলাম। তিনি আমাকে তাঁর "ডান হাত" ও মোহরদাকে "বাঁ হাত" বলতেন। অবশেষে মোহর দাদারও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হ'ল। শেষে আমিই তাঁর শিষ্য ও পুত্ররূপে রয়ে গেলাম। তিনি কৃপা করে এই মূর্খকে আদর ক'রে "শাস্ত্রী" উপাধি দিয়েছিলেন ও তাঁর আশ্রমের আচার্য ক'রে-ছিলেন। দীক্ষাদি কার্যে তাঁর আমি প্রধান ঋত্বিক্ ও তাঁর

প্রতিনিধি হ'য়ে তাঁর আদেশানুযায়ী উভয়ে মিলিতভাবে পূর্ণাহুতি দিতাম।

তখন তিনি প্রতি বৎসর শীতকালে হুগলী আসতেন। কোথা থেকে আসতেন তা কেউ জানতেন না। যেখানে থাকতেন, সেখান থেকে আমাদের এখানকার দু'চার জনকে একটি শ্লোক দিয়ে আশীর্বাদ পত্র দিতেন, ডাকঘরের ছাপও বোঝা যেত না। শুনেছি তিনি বেশীর ভাগ মধ্যপ্রদেশের দিকে থাকতেন ও পরিভ্রমণ করতেন। শিয়ালদহের নিকটবর্তী রেলওয়ে কোয়ার্টাসে তাঁর কতিপয় শিষ্য থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ৺রঞ্জন বাবুর নাম মনে পড়ে। তাঁদের ওখানে তিনি আসতেন। আবার কাঁচড়াপাড়ায় ৺হৃষিকেশ মণ্ডলের বাড়ী ও রাণাঘাটে ৺রজনী চাটুয্যের বাড়ীও আসতেন। বজ্‌বজে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এক শিবলিঙ্গ ও মন্দির তাঁর কীর্তির সাক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান। দর্শনায় (অধুনা বাংলা দেশ), দার্জিলিং-এ এবং কাশ্মীরেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির আছে। হুগলীর জগুদাস পাড়ায় বাংলা ১৩৫৪ সালে আশ্রম ও ৺মুক্তিনাথ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে ভট্টপল্লীর নিকট ৺অক্ষয় ঘোষ মহাশয়ের বাগান বাটীতে ৺মাধবেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর কোন্নগরে গঙ্গাতীরে তাঁর নামে দ্বিতীয় আশ্রম ও ৺নাগেশ্বর বাবার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীবাবার গুরু মহারাজের সমাধি মন্দির ও আশ্রম উজ্জয়িনী শহর থেকে ৬/৭ মাইল দূরে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে শিপ্রানদীর নিকট বর্তমান আছে। শ্রীশ্রীবাবা ১৭/১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালেও কথা কইতেন। তারপর কবে থেকে যে মৌনী হন সে খবর জানা যায় নাই। হুগলীতে "শ্রীশ্রীমাধবানন্দ আশ্রম" প্রতিষ্ঠার প্রায় ১০

বৎসর পরে মৌন ভঙ্গ করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি প্রতি বৎসর শীতকালে হুগলীতে আসতেন ও ৺বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, ৺সুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায় ও ৺গোহরলাল সিংহের বাটীতে ২/৩ মাস কাল যাবৎ থাকতেন। বৈষয়িক কথাবার্তা তিনি কইতেন না। দিনের বেলায় গীতাপাঠের ব্যাখ্যা ও রাত্রি ৩/৪টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ বহুবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকাদির ব্যাখ্যা সঙ্গীত যোগে হ'ত। তাঁর দরবারের গায়কদের মধ্যে ৺বিজয় দাদা ও কলিকাতার মণীন্দ্রনাথ বসু এবং মাণিকলাল দে প্রধান ছিলেন। পরে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মায়া মুখোপাধ্যায় (বিজয়দার পুত্রবধূ), নচিকেতা ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী, শ্রীমতী উৎপলা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অর্চনা চট্টোপাধ্যায় (বুলা), দেবনারায়ণ শর্মা ও ইন্দ্রনারায়ণ (সন্তোষ) শর্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সব শিষ্যদেরই দীক্ষা রাত্রি শেষে হয়েছে। লক্ষ্ণৌ শহরেও তাঁর অনেক ভক্ত শিষ্য আছেন। ওখানে প্রথমে গণেশগঞ্জে মাল বাবুর বাড়ী ও পরে মকবুলগঞ্জে গোপিনীমার বাড়ী ও তারপর ডাঃ চাঁদসীর বাড়ীতে থাকতেন ও সেখানে দিনরাত শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যাদি হ'ত।

মৌনভঙ্গের পর হুগলীতে "মাধবানন্দ আশ্রমে" একদিন রাত্রি ৯/১০ টার সময় তাঁর মুখ থেকে তাঁর গৃহত্যাগের বিবরণ শুনি। তিনি ধীরে ধীরে পূর্বস্মৃতি মন্থন ক'রে জলভারাক্রান্ত চোখে সে কাহিনী বলেন। মার উপর অভিমান ক'রে ৯ বৎসর বয়সের বালক উপনয়নের পর গৃহত্যাগ করেন। তাঁর এক ভায়ের সঙ্গে খেলা করতে করতে বিবাদ হয়। তাতে তাঁর মা ভাইকে শাসন না ক'রে তাঁকেই খুব বকেন ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। বালকের বুকে শেলের মত সেই কথা বিঁধে থাকে ও রাত্রে সকলে নিদ্রিত

হ'লে তিনি একা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। তিনি বলেন দৌড়াতে দৌড়াতে এক আশ্রমে হাজির হন। সেখানে ২।৩ দিন থেকে ভাল না লাগায় অন্য আশ্রমে যান। এইরকম ঘুরতে ঘুরতে একদিন ঠিক স্থানে এসে পৌঁছান। সেখানে দেখেন এক জটাজুটধারী সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গী মহাপুরুষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। পাঠ শেষ হলে তাঁর দিকে নজর প'ড়লে তিনি তাঁকে স্নেহভরে ডাকলেন ও আদর করে আশ্রমে স্থান দিলেন। তাঁর শ্রীগুরুদেব বহু শাস্ত্রবিদ্ ও সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। শুনেছি তাঁর নাম শ্রীশ্রীমৎ বিদ্বানন্দ স্বামী ছিল। শ্রীশ্রীবাবার বাল্যকালের নাম ছিল বেণীমাধব। তিনি তাঁর গুরুদেবের দ্বাদশ গোপালের (শিষ্যগণের) সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর শ্রীগুরুদেব তাঁকে ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চড়া, বন্দুক-রিভলবার ছোঁড়া শিখিয়েছিলেন ও তাঁকে রাজার ছেলের মত যত্নে পালন করতেন। তাঁকে বলতে শুনেছি তিনি রাজার ছেলেই ছিলেন। কিন্তু গুরুদেব সম্বন্ধে ব'লতেন তাঁর সব ভাল লাগত, কেবল যখন পড়াতে বসতেন তখন মনে হ'ত যেন জঙ্গলের 'শের' ব'সে আছেন। তিনি উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। কোনও স্থান থেকে কেউ জিজ্ঞাসু হ'য়ে গুরুদেবের কাছে এলে তিনি তাঁকে বলতেন আমার শিষ্য মাধবানন্দের কাছে যাও। যদি সেখানে তোমার প্রশ্নের মীমাংসা না হয় তখন আমার কাছে এস"।

শ্রীশ্রীবাবা বলতেন— "এ পালিস করা দেহ" —অর্থাৎ তিনি 'কায়াকল্প' করেছিলেন ; শেষ জীবনে তাঁকে ২/৩ বার মাত্র ব'লতে শুনেছি—এ শরীর আড়াইশ' বছর হয়ে গেছে। পরমপ্রসিদ্ধ বারদীর ব্রহ্মচারী মহারাজ শ্রীশ্রীবাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তবে ব্রহ্মচারী-জীর জীবনী যা পুস্তকাকারে দেখেছি, তাতে জানা যায় বেণীমাধব

ও লোকনাথকে তাঁদের উপনয়নের পর তাঁদের পল্লীস্থ সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীভগবানদাস গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখ থেকে যা শুনেছি যা উপরে বর্ণিত হ'য়েছে তা অন্য রকম। তবে লোকনাথ বাবার সঙ্গে যে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা তাঁর কাছে শুনেছি। মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর সম্বন্ধেও তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। বছর কয়েক পূর্বে কলিকাতা বালিগঞ্জ এবং ডালিয়া প্লেসে শ্রীশ্রীতৈলঙ্গ বাবার প্রশিষ্য পরমপূজ্যা শ্রীশ্রীপরমানন্দ মা'র কাছে শুনেছিলাম এবং তিনি শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে কোন্নগরে ডাঃ শচীন সর্বাধিকারীর গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীতে বাবার থাকাকালীন দর্শন করতে এলে তাঁকে সকলের সামনে ব'লতে শুনেছি শ্রীশ্রীবাবার সাথে তাঁর ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে দেখা হ'য়েছিল। মা যখন একথা বলেন তখন তাঁর বয়স ১৯৯। শ্রীশ্রীবাবার মুখ থেকে অনেকবার মোটরে বেড়াতে গিয়ে ব'লতে শুনেছি, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে লোকনাথ, হৃষিকেশের শিবানন্দ, হরিদ্বারের ভোলানন্দ, দেওঘরের বালানন্দ, শেষ হুগলী ডুমুরদহ 'উত্তমাশ্রমের' ধ্রুবানন্দ আরও অনেকে চ'লে গেছেন। "রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি দেহ যাঁহারাই ধারণ ক'রেছিলেন, তাঁদের সকলকেই দেহ রেখে যেতে হ'য়েছে, সবাই চ'লে গেছে, এ শরীরও একদিন যাবে"। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে এক সময় ব'লে-ছিলেন, "এ তো সে দিনের কথা"। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে তিনি স্বচক্ষে অশ্বপৃষ্ঠে দেখেছিলেন। বছর ছয় সাত পূর্বে লক্ষ্মৌএ এক বাগানে শ্রীশ্রীবাবার নিকট খাজুরীর এক জমিদারের সঙ্গে আলাপ হয়। বংশ পরম্পরায় তাঁদের উপাধি 'রাজা'। তাঁকে বাবার চরণতলে পড়ে কাঁদতে দেখে কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে তিনি কেন

কাঁদছিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'ইনি আমাদের বংশের গুরু। আপনার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতাজী এঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। "শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি" নাম লিখিত এঁর তৈলচিত্র আমাদের বাড়ীতে আছে। এঁর নামে "মাধবকুণ্ড" এখানে এখনও বর্তমান।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করি —তাঁর প্রপিতামহ জীবিত থাকলে এখন কত বয়স তাঁর হ'ত? উত্তরে তিনি ২১০ কি ২১২ এই রকম বলেছিলেন। এই কথাবার্তা থেকে ও তাঁর বয়স সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা হয়।

তাঁর জন্মভূমির সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়— কলিকাতার উত্তর-পূর্ব কোণে বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া গ্রাম থেকে কিছুদূরে এক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়।

তিনি সাধারণ শৈব সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক ভাবের সাধু ছিলেন। কালিঘাটে মা'র দর্শনে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে শিষ্য-ভক্তদের সঙ্গে যেতেন এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরেও শ্রীবিগ্রহ দর্শন ক'রতেন। মার মন্দিরে সমস্বরে চণ্ডী আবৃত্তি হ'ত আর রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে আমাকে দিয়ে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করাতেন :—

"যেষাং শ্রীমদ্ যশোদাসুতপদ কমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাম্
যেষামাভীর কন্যা প্রিয়গুণকথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিত পদকথা স্বাদরো নৈব কর্ণঃ
ধিক্‌তান্ ধিক্‌তান্ কথয়তি নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গ॥

শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ ও দ্বারকাধামে তাঁর সঙ্গেই শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য হ'য়েছিল। প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভেও তাঁর সঙ্গে ত্রিবেণীতে গেছলাম। এখন এই স্মৃতিটুকু নিয়েই বেঁচে আছি। হুগলী

আশ্রম প্রতিষ্ঠার ২/৩ বৎসর মধ্যে একবার শ্রীশ্রীবাবা লক্ষ্ণৌ-এ লক্ষ্মীপদ সরকারের বাসাবাড়ীতে যান। খবর পেয়ে আমরাও কয়েকজন সেখানে যাই। সেই বাড়ীর মালিক ছিলেন রেলের এক "মালবাবু" (Goods-Clerk)। সেইবারই লক্ষ্ণৌ-এ মালবাবুর বাটীতে প্রথম দরবার হয়। তারপর প্রতি বৎসর ঐ বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবা আসতেন ও হুগলীবাসী ভক্তদের খবর দিতেন। আমরা সেখানে যেতাম ও দিনে রাতে নিয়মিতভাবে তাঁর দরবার বসত। একবার হুগলীর ভক্তবৃন্দ তাঁর দর্শনে গেলে একদিন তিনি বৈকালে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও দু'খানি মোটরে সকলকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। গোমতী নদীর উপর এক সেতু আছে। তার বর্তমান নাম "হনুমান্ সেতু"। আমাদের সঙ্গে ছিলেন তেওয়ারীদা। সেতুর মুখে গাড়ী থামিয়ে তেওয়ারীদা বল্লেন, "বাবা নদী কিনারায় এক মহাত্মা আছেন, যাবেন?" শ্রীশ্রীবাবা ইঙ্গিতে বললেন, "তোরা যা, দেখে আয়"। কয়েকজন গেলেন। খানিকপর ৺সুশীলদা, তেওয়ারীদা ও সাধুর পক্ষ থেকে একজন লণ্ঠন নিয়ে উপরে এসে বাবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে গাড়ী থেকে নামালেন। আমরা বাবার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নীচে গিয়ে দেখলাম, গোমতী নদীর তীরে অনেক লোক বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন সাধু সৎসঙ্গ করছেন। সেই মহাত্মা শ্রীশ্রীবাবাকে আলিঙ্গন করে "মোর প্যারে, মোর প্যারে" বলতে থাকেন। সেখানে শ্রীশ্রীবাবা আমায় একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করতে আদেশ দেন। এই মহাত্মার নাম নারায়ণ স্বামী। বাবাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার সঙ্গে তাঁর ঐ রকম ব্যবহার দেখে মনে হ'ল আপনার সঙ্গে উনি বিশেষ পরিচিত। বাবা জানালেন

"ওর নাম নারায়ণ স্বামী। পূর্বে কাশ্মীরের জজ্ ছিল। নৈমিষারণ্যে ওর খোঁজে গেছলাম, ওর দেখা পাইনি। তারপর এখানে দেখা।" শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি করে জানলেন ইনি এখানে আছেন? তেওয়ারীদা নিজে থেকে গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—নীচে মহাত্মা দর্শনে যাবেন কিনা? তাতে হেসে লিখলেন—"বিনা তার কা টেলিগ্রাফ্।"

শ্রীশ্রীবাবা প্রতি বৎসর প্রথমে লক্ষ্ণৌ আসতেন। পরে হুগলীর ভক্তরা খবর পেলে তাঁকে আনতে যেতেন ও তিনি তাঁদের সঙ্গে হুগলী আসতেন। কখনও কখনও হঠাৎ একা এসে হাজির হ'তেন। লক্ষ্ণৌএ প্রথম কয়েক বৎসর মালবাবুর বাড়ীতে আসতেন ও সেখানে থাকতেন। পরে মক্‌মুলগঞ্জে গোপিনীমার (বটুর মা) বাড়ীতে এসে থাকতেন। 'চাঁদসীদার (ডাঃ সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়) বাড়ীতেও থাকতেন। লক্ষ্ণৌএ তাঁর বাড়ীতেই শেষ দরবার হয়। শেষ হুগলী-কোন্নগর আশ্রম থেকে অসুস্থ অবস্থায় তিনি লক্ষ্ণৌএ আসেন ও বটুর মার বাড়ীতেই দেহ রক্ষা করেন। লক্ষ্ণৌএ বাবার শিষ্য ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রী নির্মল ব্যানার্জি, গোপীনাথ সেন, শৈলেন রায়, বটু, চাঁদসীদা, গোপিনীমা, মেজর তরুণ দেব, মণীন্দ্র সান্যাল, সুষমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেক। যাঁরা বাইরে থেকে আসতেন তাঁরা সান্যালদার বাড়ীতে থাকতেন।

নরলীলা সম্বরণের ২/১ বৎসর পূর্বে তিনি মনে মনে কোন্নগর আশ্রমে গঙ্গাতীরে আশ্রমের দক্ষিণ দিকে ৺নাগেশ্বর বাবার মন্দিরের নিকট দেহ রাখবার ইচ্ছা করেছিলেন। তৎসম্বন্ধে একদিন আমাকে বলেন, "আমি এরপর নীচেই থাকব, উপরে আর ওঠানামা করতে

পারব না।" তারপর তিনি মধ্যপ্রদেশে কাহাড়া নামক গ্রামে যাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেন। তখন সেখানে দেহ রাখবার ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য সেখান থেকে তাঁর দু'জন চেলাবাবাকে আনিয়ে ছিলেন। এই সময় তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী ও প্রায়ই অন্তর্মুখী থাকতেন। সব কথা তাঁর সকলে সব সময় ধরতে পারত না, অনেক সময় তাঁর ভাবেরও বিপরীত ধারণা করে বসত। চেলাদের মধ্যে রতন গিরি নামে যিনি এসেছিলেন তাঁকে আমি "মোহন্তজী" বলেই জানতাম। সেই সময় একদিন তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন 'বাবা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কেন তা কিছু বলেন নি।' পরে একদিন বাবা তাঁকে বলেন "এখানে কি করতে তোমরা এসেছ? কিজন্য পড়ে আছ? চ'লে যাও।" তাঁরা দণ্ডবৎ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাবার তখন বেহুঁশ অবস্থা। পরদিন তাঁরা দু'জনে বাবাকে প্রণাম করতে গেলে তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বলেন, তিনি যেতে বলেছেন, তাই চলে যাচ্ছেন। তখন তিনি কি ভেবে বল্লেন "আরে! তুমলোগ চলা যাওগে! হামারা অন্তিম কালমে তুমলোগ চলা যাওগে! দো-দশ রোজ আউর ঠার যাও। কুছ ক্রিয়া করম ভি হোগা। ইয়ে লোক সব গৃহস্থী হ্যায়, ও লোগোন্‌কো ইয়ে সব কুছ মালুম না হ্যা।" তারপর মোহন্তজী ও চেলাবাবা কিছুদিন ছিলেন। তখন তিনি কোন্নগরেই দেহরক্ষা করবেন মনে ক'রেছিলেন। কিন্তু পরে মোটরে শায়িত অবস্থায় লক্ষ্ণৌ হ'য়ে কাহাড়ায় যান। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে লক্ষ্ণৌ আসেন ও সেখান থেকে কোন্নগর আশ্রমে ৺নাগেশ্বরের অন্নকূট উপলক্ষে ভক্তদের সঙ্গে কোন্নগর আসেন। কিছুদিন পর ৺বৈদ্যনাথধামে যান। সেখান থেকে কেবল কাহাড়া যাবার জন্য ব্যস্ত হন। বৈদ্যনাথধাম হ'তে কোন্নগরে আসেন, কিন্তু কাহাড়া যাবার জন্য ব্যগ্র হ'লে গাড়ী করে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়। লক্ষ্ণৌতে চাঁদসীদার বাড়ী হতে

নির্মলদার বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় ও কিছুপরে গোপিনীমার বাড়ীতে রাত্রিকালে পৌঁছান। ঐখানেই ২/১ দিনের মধ্যেই বাংলা ১৩৮০ সালে শ্রীপঞ্চমীর দু'দিন পূর্বে শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে রাত্রি ১টার সময় বিশ্ববাসী সকলকে নিদ্রাচ্ছন্ন ক'রে নিঃশব্দে মহাসমাধিতে চিরতরে মৌন হন।

লক্ষ্ণৌ থেকে শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র দেহ মোটর যোগে প্রথমে হুগলী আশ্রমে সরস্বতী পূজার দিন ৺মুক্তিনাথের সামনে আনা হয়। ওখান থেকে কোন্নগর আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর দেহ শুক্লা সপ্তমী তিথি বুধবারের প্রভাতে গঙ্গাতীরে সমাহিত করা হয়। তাঁর দেহান্তের খবর হুগলীতে পৌছাবার পর থেকেই হুগলী আশ্রমে প্রায়ই চন্দন বৃষ্টি হ'তে দেখা গেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি থেকে শ্লোকাদি উদ্ধার করে কাগজে লিখে সেই সব শ্লোকাদি তাঁর প্রিয় ব্যাখ্যাকারদের দিয়ে সকলকে উপদেশ দিতেন। হুগলী আশ্রমে পূর্বে সারারাত্রি প্রত্যহ দরবার চলত। তখন দিনের বেলা কাউকে দিয়ে গীতার সন্দীপনী পড়াতেন ও রাত্রে পুরো দরবার বসত।

তাঁর যে কি অনাবিল অজস্র ভালবাসা ও করুণা পেয়েছিলাম, তা বলি কারে; যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কিছু জানেন, মূর্খকে পণ্ডিত করলেন। একাধারে মা, বাবা ও গুরুর সমস্ত স্নেহ ভালবাসা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। তাই সর্বজনপ্রসিদ্ধ গুরু মন্ত্রটি সার্থক হয়, যখন তাঁকে প্রণাম করি এই বলে —

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেবঃ॥
জয় গুরু তোমারি জয়।
হরি, ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

সনাতন ধর্ম-দীপিকা

বেদ

"শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। সত্য দুই প্রকার— (১) যাহা মানব সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তৎ উপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত; (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা হয়।

বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞান রাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তি দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'।"

স্বামী বিবেকানন্দ

ঋষিগণ বেদ রচনা করেন নাই, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র।

ভগবান আদি গুরু—তৎকর্তৃক উচ্চারিত ও প্রকাশিত বেদই অপরে লাভ করিয়াছেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি; কারণ উহা পূর্বে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হইয়া সমাজে প্রচলিত হইত ও যজ্ঞাদি সম্পাদনে নিযুক্ত হইত। বেদ কোনও পুরুষের দ্বারা রচিত নহে।

(ব্রঃ সূঃ ১।১।৩ ও ১।৩।২৮-৩০)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে বেদ ১২০০ হইতে ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের দ্বারা দেখাইয়াছেন, "মিশরে নীল নদের উপত্যকা এবং মেসোপোটেমিয়ার ফুরৎ দিজলহ্ অর্থাৎ এইফ্রেতেস্ ও তিগ্রিস্ নদীর অন্তর্বেদী বাড়ীঘর, ক্ষেতখামার, নগর-মন্দির এবং রাজা, পুরোহিত, চাষী, শিল্পী, বণিক, সৈনিক প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া যে মানব সভ্যতার আদি পত্তন হয়, তাহার সর্বপ্রথম যুগের ক্ষেত্রে ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার এই দুইটি নদীমাতৃক দেশ, ইহা এখন হইতে প্রায় ৬০০০ বছরের অনধিককালের কথা।"

তাঁহার মতে ভারতে আগত আদি আর্য্য জাতির পুর্বপুরুষ ইন্দ-ইউরোপীয় জাতি। তাহারা ছিল অর্দ্ধ যাযাবর। তাহারা দক্ষিণে কৌকেসস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর ইরাকে আসে; তথায় তাহারা খৃঃ পূঃ ২০০০ এর দিকে উপনিবিষ্ট হইয়া বাস করিতে থাকে; ঐ অঞ্চলে তাহাদের নাম হইল 'আর্য্য', এবং তদনন্তর তাহারা ইরাণদেশ হইতে ভারতবর্ষে পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করে— তাহা হইতেছে খৃঃ পূঃ ১৫০০ এর পরের কথা। তাঁহার মতে ঋগ্বেদ সংগৃহীত সূক্ত ও স্তোত্র অথবা কবিতা এই সময়েই রচনার প্রারম্ভ হয়। তাঁহার যাহা কিছু যুক্তি-তর্ক সবই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যুক্তি তর্কের উপর নির্ভরশীল এবং তিনিও সেই ভাবেই প্রভাবিত হইয়াছেন।

পরাশর পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস; অর্থাৎ যিনি বেদ সংগ্রথন করিয়াছিলেন। উহা মহাভারত কালের কথা। বেদব্যাস যখন বেদগুলি সংগ্রথন করেন তখনই ঐগুলি অপৌরুষেয় বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে বেদ কত প্রাচীন। বেদ কত প্রাচীন এ বিষয় লইয়া তর্ক করার ইচ্ছা আমার নাই, কারণ আমার উদ্দেশ্য বেদ-বেদান্ত কি, তাহাতে আমরা কি পাই, তাহাই জানা।

বেদব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার্য্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্র সমূহকে এক এক স্থানে সংহত করিয়া তাহাদিগকে তিনটি বেদগ্রন্থাকারে বিভক্ত করিলেন। এবং অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি অথর্ববেদে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহাই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ।

(১) ঋকবেদ=পদ্য (২) যজুর্বেদ=গদ্য,

(৩) সামবেদ=গীতি ও (৪) অথর্ববেদ।

প্রতিবেদেই দুইটি অংশ; মন্ত্র (সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ।

তবে সাধারণতঃ এই চার ভাগে বিভাগের মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। যথা, প্রথমে তৈত্তিরীয় সংহিতা তারপর তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, অতঃপর তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং সর্ব্বশেষে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। এইরূপে বেদের অন্তে বা শেষে নিবদ্ধ হওয়ায় উপনিষৎ প্রতিপাদ্য বিদ্যা বেদান্ত নামে পরিচিত। নিয়মিত পাদাক্ষর ও ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে ঋক্ বলে। যজ্ঞকালে হোতা ও তাহার সহকারীরা ঋক্ মন্ত্রে দেবতার স্তব করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিতেন।

গীতিরূপ মন্ত্র 'সোম'। সামবেদে যে সকল মন্ত্র আছে তাহার প্রায় সমস্তই ঋক্ মন্ত্রের উপর নির্ভর করে। উদ্গাতা ও তাহার সহকারিগণ সামগান করেন।

গদ্য মন্ত্র যজুঃ। অধ্বর্যু ওতাহার সহকারিগণ যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে প্রধানতঃ বিধি, নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ, উপাসনা ও ব্রহ্মবাদ নিবদ্ধ আছে। এই অংশ গদ্যে রচিত।

ব্রাহ্মণের একটা অংশকে আরণ্যক বলে, কারণ তাহা অরণ্যে পঠিত হইত।

অথর্ববেদে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, অন্যদিকে সেরূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ উচাটন প্রভৃতিও আছে।

যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয়।

সমগ্র বেদকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। আরণ্যক ও উপনিষদ অতিরিক্ত সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সমূহ মুখ্যত কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাহারা প্রধানতঃ যজ্ঞাদি কার্যেই প্রযুক্ত হয়। আরণ্যক ও উপনিষদ সমূহের বিশেষ উদ্দেশ্য উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদন।

চতুর্ধা বিভক্ত বেদ শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে আরও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের যে অংশ এখনও সাধারণ্যে প্রচলিত তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত।

কোনটি কোন বেদের অন্তর্গত তাহা নিম্নে দিলাম :—

ঋগ্বেদের অন্তর্গত :—ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণদ্বয়।

সামবেদ অন্তর্গত :— তাণ্ড পঞ্চবংশ বা পৌঢ়, তলবকার বা জৈমিনীয় ও ছান্দগ্য ব্রাহ্মণ।

শুক্ল যজুর্বেদ অন্তর্গত :—শতপথ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদ অন্তর্গত :—গোপথ ব্রাহ্মণ।

উপনিষদ শব্দের অর্থ—ঐকাত্ম্য নিশ্চয়ের দ্বারা যে বিদ্যা সত্বর সহেতুক সংসার উন্মুলিত করে; কিংবা যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ-পূর্বক তৎনিষ্ঠ হইয়া নিঃসংশয়ে উহার অনুশীলন করিলে উক্ত বিদ্যা

অবিদ্যাদি সংসার বন্ধনকে শিথিল বা নিঃশেষে বিনাশ করে সেই বিদ্যা। ইহাকে রহস্য বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলে। হৃদয় গুহায় নিগূঢ়রূপে অবস্থিত ব্রহ্মের বিষয়ে এই বিদ্যা উপবিষ্ট হয় এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন ইহা অপ্রাপ্য। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

উপনিষদুক্ত বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না। ঐগুলি সঠিকভাবে বুঝিবার জন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদগীতাই সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই প্রস্থানত্রয় বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি।

উপনিষদ অবলম্বনে প্রধানতঃ চারটি মতবাদ উত্থিত হইয়াছে; অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈত। ইহার কারণ সমন্বয় সূত্র করিতে না পারা। তবে প্রকরণ ভেদ থাকিলেও প্রতিপাদ্য বস্তু বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। এই সকল মতবাদের মধ্যে অদ্বৈত মতবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে।

আত্মার একত্বই উপনিষদ সমূহের মূল বক্তব্য। অপর যাহা কিছু তাহা উক্ত প্রতিপাদনেরই সহায়ক মাত্র।

মনোবাক্যাতীত ব্রহ্মকে পুস্তকপাঠ বা বক্তৃতা শুনিয়া বুঝা একেবারেই অসম্ভব। এই বিদ্যা গুরু পরম্পরায় আগত। বিশেষ বিনীতভাবে শিষ্য কর্তৃক গুরুর সমীপে অবস্থান, গুরু মুখে বেদান্ত বিচার, শ্রবণ, তৎপরে মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই এই বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করা যায়।

এই বেদান্ত বিচার শ্রবণের অধিকার সকলের নাই। যিনি যথাবিধি বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন-পূর্বক সামান্যতঃ বেদার্থ অবগত

হইয়া এই জন্মে বা পূর্বপূর্ব জন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, জাতেষ্টি ও যজ্ঞাদি, নৈমিত্তিক কর্ম, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রহ্ম বিষয়ক উপাসনার দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া নির্ম্মল-চিত্ত হইয়াছেন এবং যিনি নিত্য-অনিত্য বস্তু-বিবেক, ইহা মূত্রফল-ভোগ-বিরাগ, শমাদি, সাধন-সম্পত্তি ও দৃঢ় বৈরাগ্যযুক্ত মোক্ষাভিলাষী তিনিই বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী।

আপাততঃ উপনিষদ সম্বন্ধে এই পর্যন্তই থাক, পরে বেদান্ত সম্বন্ধে আবার লিখিব। এখন বেদের কথা কিছু বলিব।

বেদ কোনও একটি গ্রন্থ নয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া রচিত ও আচার্য্য পরম্পরায় সংরক্ষিত বহু গ্রন্থের সমষ্টিকে ব্যাপক অর্থে বেদ আখ্যা দেওয়া হয়। ঐগুলি প্রাচীন মন্ত্র, স্তোত্র প্রভৃতি সংকলন, যথা ঋগ্বেদ, সংহিতা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সমূহ আরও পরবর্ত্তীকালে রচিত। আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণের ও উপনিষদগুলি আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত।

ঋক্ অর্থ মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা নানা দেবতার স্তুতি আছে; যথা বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নানা দেবতা। যে মন্ত্রগুলিতে একই দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে, সেগুলি একত্র করিয়া এক একটি 'সূক্ত' হইয়াছে।

যথা ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তে ৮টি ঋক্ বা মন্ত্র আছে; অগ্নিদেবতার স্তুতি করা হইয়াছে।

১ম ঋক্ :—

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥"

বঙ্গানুবাদ :—অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্ অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী, আমি অগ্নির স্তুতি করি।

২য় ঋক্ :—

"অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভি রীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি"॥

বঙ্গানুবাদ :—পূর্বতন ঋষিগণ যাঁহার স্তব করিয়াছেন, অধুনাতন মুনিগণ যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, অনন্তকাল যাঁহার স্তব চলিতেছে, সেই অগ্নিদেব সর্বদেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

ঋক্ বেদের ১০২৮টি সূক্ত আছে এবং ঋক্ মোট ১০৫৫২ (শাখল শাখাতে)

সামবেদ সংহিতায় মোট ঋক্ ১৮১০; পুনরুক্তি বাদ দিলে মোট ঋক্ সংখ্যা ১৫৪৯। সব ঋক্‌গুলিই ঋগ্বেদের কোনও না কোন অধুনালব্ধ বা অধুনালুপ্ত শাখা হইতে সংগৃহীত।

সামবেদের দুই ভাগ— আর্চিক ও উত্তরার্চিক। আর্চিক ভাগে মোট ৫৮৫ ঋক্ সংকলিত আছে। উত্তরার্চিক ভাগে ৪০০ স্তোত্র সংকলিত আছে। অধিকাংশ স্তোত্রে তিনটি করিয়া ঋক্।

বৈদিক যজ্ঞে যে পুরোহিত সামগান করিতেন, তাঁহাকে উদ্গাতা বলা হইত। সামবেদের সঙ্গে সংযোজিত আরও এক রকম সংকলন পাওয়া যায়, তাহার নাম 'গান'। গানও অনেক প্রকার। যথা :— স্তোত্র, গ্রামগেয়, অরণ্যগান ইত্যাদি।

যজুর্বেদ সংহিতা,— মূল বিষয়বস্তু যাগযজ্ঞ। প্রধানতঃ চারজন ঋত্বিক বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন; হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। উদ্গাতা সামবেদ হইতে সামগান করিতেন। অধ্বর্যু যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক

দিক্ সম্পাদন করিতেন ও যজুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করিতেন, এবং ব্রহ্মা অথর্ববেদ অনুসারে ঋত্বিক কর্ম পরিচালনা ও পরিদর্শন করিতেন।

অথর্ববেদ সংহিতা :— ইহার অনেক শাখা ছিল। শোনক শাখাই প্রচলিত। মোট মন্ত্রসংখ্যা ৫৯৭৭। সূক্ত সংখ্যা ৭৩১— কুড়ি কাণ্ডে বিভক্ত। ইহার অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। অথর্ববেদে জাদুমন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রগুলিতে রোগ-নিরাময়ের পক্ষে উপযোগী নানা রকম লতাগুল্ম প্রভৃতির নির্দেশ পাওয়া যায়। এই অথর্ববেদে স্ত্রীকর্মানি, অভিচারীণি প্রভৃতি নানা রকম মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

যজ্ঞের বিধি নিষেধই ব্রাহ্মণের মূল বিষয়বস্তু।

অপর পৃষ্ঠায় একটি ছক্ দিলাম, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি বুঝিবার জন্য :—

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ
ঋগ্বেদ	১। ঐতরেয় ২। কৌষিতকী বা সাংখ্যায়ন	১। ঐতরেয় ২। কৌষীতক	১। ঐতরেয় ২। কৌষীতক
সামবেদ	১। তাণ্ডমহা বা পঞ্চবিংশ ২। ষড়্‌বিংশ ৩। জৈমিনীয়	১। জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ	১। ছান্দোগ্য ২। কেন
কৃষ্ণ-যজুর্বেদ	১। তৈত্তিরীয়	১। তৈত্তিরীয়	১। তৈত্তিরীয় ২। কঠ ৩। শ্বেতাশ্বতর ৪। মৈত্রায়নীয় বা মৈত্রী
শুক্ল-যজুর্বেদ	১। শতপথ	১। শতপথ ব্রাহ্মণের অংশ বিশেষ	
অথর্ববেদ	১। গোপথ		১। মুণ্ডক ২। প্রশ্ন ৩। মাণ্ডুক্য

ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের দুইটি মন্ত্র পূর্বে দিয়াছি ; শেষটি অতি সুন্দর তাই এখানে দিতেছি।

"অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি সোমং মধু
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥"

এখানে বলা হইয়াছে, অগ্নিদেব আপনি মরুদ্গণকে লইয়া আগমন করুন।

বেদের অর্থ ও উচ্চারণ

এই বিষয়ে দুই মত আছে। এক মতে বেদের মন্ত্র অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। উহা যথাযথ উচ্চারিত হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থ জানার প্রয়োজন নাই। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপ্রদেশে এই মত প্রবল। সায়ণাচার্যের ভাষ্যের মধ্যে দেখা যায়, তিনি উচ্চারণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। কিন্তু মনু বলিয়াছেন, বেদার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইবে।

ঋক্বেদের মন্ত্রগুলি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ এই সকল মন্ত্র পাঠ দ্বারা নানা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করিতেন। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ছিল যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। বহু দেবতাই সেই একই ঈশ্বরের বিকাশ, যথা "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি", অর্থাৎ তিনি এক সত্য (নিত্য) তাঁহাকেই বিপ্রগণ নানা নাম দিয়া থাকেন।

ঋক্ ১/১৬৪/৪৬

"নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং" ইত্যাদি।

ঋক ১০/১২৯

ঋক্বেদে বহু আখ্যায়িকার সংকেত পাওয়া যায়। তাহার একটি সংক্ষেপে দিলাম :—

ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'যদি ইহা অন্য কাহাকেও বল তাহা হইলে তোমার শিরচ্ছেদন করিব।' অতঃপর অশ্বিদ্বয় দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া অন্যত্র রাখিয়া তাহাতে এক অশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া পরাইয়া দিলেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়কে দধীচি ঋষি প্রবর্গ্য বিষয়ক ঋক্, যজুঃ ও সাম এবং মধুবিদ্যা প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যাপন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিয়া বজ্রের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করেন। তখন অশ্বিদ্বয় দধীচির নিজের মস্তক, যাহা অন্যস্থানে রাখা ছিল, তাহা পরাইয়া দেন।

শাট্যায়ন=বাজসনের প্রপঞ্চে ইহা উক্ত আছে।

ঋগ্বিধান

ঋগ্বেদের মন্ত্র মাহাত্ম্য

মহর্ষি শৌনক ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রথম দুই পংক্তি নিম্নে দিলাম—

"নিষ্কৃতির্ণহি বেদানাং মন্ত্রানাং কলিদোষতঃ।
কলিদোষ নিবৃত্ত্যর্থং গায়ত্রীমাশ্রয়ে দ্বিজঃ॥

এইরূপ ৪৮৪ পংক্তি আছে।

বৈদিক সাহিত্যে বেদ বলিতে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ বুঝায়। কিন্তু বেদপাঠের সহায়ক হিসাবে আরও নানা প্রকার সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল।

সামগ্রিকভাবে ঐ সাহিত্যকে 'বেদাঙ্গ' আখ্যা দেওয়া হয়।

বেদাঙ্গ ছয় প্রকার :—

(১) 'শিক্ষা'—বেদের নির্ভুল উচ্চারণ পদ্ধতি বাঁধিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই রচিত।

(২) কল্প—বিধিনিষেধ সহজভাবে বুঝাইবার জন্য সূত্রাকারে রচিত যথা, কল্পসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, শুল্বসূত্র ইত্যাদি।

(৩) ব্যাকরণ—সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, একমাত্র 'পাণিনি সূত্র' প্রাচীনতম ব্যাকরণ।

(৪) নিরুক্ত—ঋগ্বেদের আখ্যা।

(৫) ছন্দ—বৈদিক ছন্দ সংক্রান্ত আলোচনা।

(৬) জ্যোতিষ—বিভিন্ন তিথি-নক্ষত্র অনুসারে বিভিন্ন বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি।

সর্ব্ব প্রাচীন ও গদ্যে রচিত উপনিষদ্ :—

(১) ঐতরেয়, (২) বৃহদারণ্যক, (৩) ছান্দোগ্য, (৪) তৈত্তিরীয়, (৫) কৌষীতকী। তৎপরে আংশিক পদ্যে রচিত— (৬) কেন। তাহার ওপর— (৭) ঈশা, (৮) কঠ, (৯) শ্বেতাশ্বতর, (১০) মুণ্ডক, (১১) প্রশ্ন।

সর্ব্বশেষ ও গদ্যে রচিত—(১২) মৈত্রী ও (১৩) মাণ্ডুক্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ :—ইহা শুক্ল যজুর্বেদ অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশ। ইহার তিনটি কাণ্ড—মধু, মুনি ও খিল। মধুকাণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মুনিকাণ্ডে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের সম্বন্ধে বাদন্যয়ে ঐ উপদেশের সত্যতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। প্রথমে উপাসনার উল্লেখ আছে। কিন্তু উপাসনাই ইহার মূল উদ্দেশ্য নহে। বৈদিক ক্রিয়া হইতে ক্রমে ব্রহ্ম-বিচারের পথে লইয়া যাইবার এই পদ্ধতি।

হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই সংসারের অন্তর্ভুক্ত এবং অনিত্য। যিনি শাশ্বত অদ্বিতীয় আত্মা, তিনি সংসারাতীত। তিনি "নেতি নেতি" রূপেই নির্দ্দেশ্য (২/৩/৬) ব্রহ্মই একমাত্র সত্য (২/৫) আত্মাকে

জানিলেই সব জানা হইল (২/৪/৬) অদ্বৈত জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (৩/৫/১) ও (৪/৪-২২-২৩)। মূল বক্তব্য মধুকাণ্ডেই বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে বিচার-পূর্ব্বক উহাদের সমর্থন করা হইয়াছে। উপাসনা ও উপাসনাযুক্ত কর্মের ফলে 'দেবলোক' যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠলোক তাহা পাওয়া যায়। ইহাও সংসারের অন্তর্ভুক্ত। ইহার অধিক পাওয়া যায় না। (১।৪।১৭)

কয়েকটি সুন্দর সূক্ত দিয়া বৃহদারণ্যকোপনিষদ সমাপ্ত করিব :—

"ই হৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্বয়ং

... ...

... ...

দুঃখমেবাপিয়ন্তি" ৪।৪।১৪

অর্থাৎ, এই দেহ থাকিতেই আমরা কোনও প্রকারে ব্রহ্মকে জানিয়াছি। যদি না জানিতাম, তবে আমি জ্ঞানহীন হইতাম এবং বিনাশ ঘটিত। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন; কিন্তু অপরেরা দুঃখ প্রাপ্ত হন।"

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।

অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ৪।৪।৭

অর্থাৎ, পুরুষ হৃদয়ে যে সকল কামনা আছে তাহারা যখন সমূলে নষ্ট হয় তখন সব মানুষ অমর হয়—এই শরীরেই সে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।

"... ... ... তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।"

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

ভূঃ স্বাহা, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
ভূঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।
স্বঃ স্বাহেতি··· ··· ··· ইত্যাদি" ৬।৩।৬

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ৫।১।১

অর্থাৎ, তিনি পূর্ণ ইনিও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণে পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে [redacted]।

এই শ্লোকের ছন্দ, অর্থবোধ, ভাবগাম্ভীর্য ও রসানুভূতি এই চারি বস্তুর সমন্বয় করিয়া শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ইচ্ছানুসারে, শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন "স্তব কুসুমাঞ্জলিতে"।

"উহা (পরমব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহাও (নামরূপস্থ ব্রহ্ম) পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন; পূর্ণের (কার্যব্রহ্মের) পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে পূর্ণ (পরব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী উপনিষদ গ্রন্থাবলীতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"তিনি পূর্ণ ইনিই পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ (অর্থাৎ স্বানুভাবগোচর) করিলে পূর্ণ ই থাকিয়া যায়।

কিন্তু ইহা ভালভাবে বুঝিবার জন্য বৃহদারণ্যকোপনিষদে কি আছে শ্লোকটিতে তাহা জানা দরকার :—

ওঁ "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরং খমতি হ স্মাহ কৌরব্যায়নী-পুত্রো বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্॥

শেষাংশটির অর্থ, ওমই আকাশ ব্রহ্ম—আকাশ চিরন্তন। কৌরব্যায়নী পুত্র বলিয়াছেন, বায়ুর আকাশই আকাশ। যিনি বিজ্ঞেয় (ব্রহ্ম) (লোকে) তাঁহাকে প্রণবেরই দ্বারা জানে বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়াছিলেন (যে), উহা (ব্রহ্মের) বাচক।

ইহার প্রকৃত অর্থ ইহাই দাঁড়াইতেছে, যিনি নিরুপাধিক পূর্ণব্রহ্ম তিনি সোপাধিক্ পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন; কিন্তু উপাধিনিবন্ধন তাহার, স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না। তাঁহার স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পূর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—উপাধির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে উহা বলা চলে না।

ব্রহ্মের স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না বলিয়াই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পূর্ণস্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয়।

ব্রহ্মকে নির্গুণ ভাবে চিন্তা করুন বা স্বগুণ ভাবেই চিন্তা করুন, তাহাতে প্রণবের বাচকত্ব বা প্রতীকত্ব ব্যাহত হয় না।

"ওম্ খম্ ব্রহ্ম"— এই মন্ত্রে প্রণবে ব্রহ্মের ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে।

বেদান্তের এই মন্ত্র, "ওঁ পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি বুঝিবার জন্য অনেক আলোচনার প্রয়োজন। যে ব্রহ্মবাদী-শিষ্য গুরুর নিকট বেদান্ত বিচার শ্রবণ করিয়া, বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ (অংশ) ব্রাহ্মণ ভালভাবে পাঠ করিয়া তাহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার জন্যই পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই এই মন্ত্রটি দেওয়া হইয়াছে। যিনি এই মন্ত্র সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবেন, তিনি মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

সাধারণের জন্য ইহা "শান্তি বচন"। যজ্ঞে, হোমে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "পূর্ণাহুনে" আহুতি দেওয়া হয় স্বাহা মন্ত্রে, সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য।

ছান্দোগ্যোপনিষদ

উপাসনা এই উপনিষদের একটি বিশেষ বর্ণনীয় বিষয়।

সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপাররূপ শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতিই উপাসনা।

(ছা: ৩/১/১-২ এবং বৃ: ৫/৬/১)

ইহাতে বিচারের স্থান নাই— শুধু বিশ্বাস। উপাসনা দুই প্রকার— ব্রহ্ম উপাসনা ও প্রতীক উপাসনা। ব্রহ্মকে যখন গুণ-বিশিষ্টরূপে চিন্তা করা হয়, তখন উহাই ব্রহ্মোপাসনা। তবে বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে হয়। প্রতীকের প্রাধান্য থাকিলে ব্রহ্মধ্যান হইতে পারে না।

প্রতীক বলিতে, বৈদিক ওঙ্কার, পৌরাণিক প্রতিমা বা তান্ত্রিক যন্ত্র ইত্যাদি বুঝায়। প্রতীক উপাসনা দুই ভাগে বিভক্ত—সম্পদ ও অধ্যাস।

শালগ্রামে বিষ্ণুপূজা অধ্যাস, প্রতিমার পূজা সম্পদ উপাসনার দৃষ্টান্ত।

ওঙ্কারে যে উপাসনা তাহা সম্পদ উপাসনা। প্রতিমার যে দেবদেবীর প্রতিমা তাঁহারই পূজা হয়; ওঙ্কারেও তাই। কিন্তু শালগ্রামে শিলার পূজা হয় না, বিষ্ণুর পূজা হয়; ইহাই পার্থক্য। উপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন হয়। ব্রহ্মলাভের পথ অতি দুর্গম। উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় মাত্র, প্রথম

ধাপ। পরে মন যেমন অন্তর্মুখ হইতে থাকে, তেমনি স্তরে স্তরে দেবগণের উপাসনা, সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনা ও জ্ঞাননিষ্ঠা উপদিষ্ট হয়। সব উপনিষদেই এই প্রণালীই অবলম্বিত হইতেছে।

আমরা সাধারণভাবে যাহাকে উপাসনা বলিয়া থাকি তাহার সহিত ভক্তির কোনও প্রভেদ নাই। 'বৈদিক উপাসনা' কিন্তু ভক্তি হইতে কতকটা অন্যরূপ। ভক্তিমার্গে সাধারণত: দ্বৈতমতই অনুসৃত হয়। কিন্তু বৈদিক-উপাসনা-মার্গ অদ্বৈত মার্গের সহায়ক।

এই উপনিষদে ওঙ্কার উপাসনা প্রভৃতি নানারকম উপাসনা আছে। ইহাতে কয়েকটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও আরুণি উপাখ্যান আছে। সপ্তম অধ্যায়ে নারদ-সনৎ-কুমার সংবাদ, অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে, ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ। ইন্দ্র গুরু সকাশে ১০০ বৎসর বাস করিয়াছিলেন, সেই কথা ইহাতে আছে।

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন—

"সাদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।"
তদৈক্ষত বহুস্যাং" ছা: ৬।২।৩

যাহারা প্রতিদিন পূজাপাঠ করেন তাঁহাদের ছান্দোগ্যোপনিষদ প্রতিদিন এক অধ্যায় করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক অধ্যায় পাঠ করিয়া উহার বিষয়বস্তু মনে মনে চিন্তা করিলে উপাসনার কি উপকার তাহা বুঝিতে পারিবেন। মনে বিশ্বাস রাখিবেন, মুনি ঋষিরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সবই সত্য।

ঈশোপনিষদ

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। উক্তরূপ ত্যাগের দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা (ধনের) আকাঙ্ক্ষা করিও না (কারণ) ধন আবার কাহার? এইভাবে সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হইল।

কেনোপনিষদ

তপস্যা, উপশম, কর্ম, সত্য, অমানিত্ব ইত্যাদির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত। সত্যই যে ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষ সাধন তাহা এই উপনিষদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কঠোপনিষদ

ইহাতে নচিকেতা ও যমের কথা আছে। এই উপাখ্যান অতি সুন্দর :—

বিশ্বজিৎ পুত্র নচিকেতা। বার বার এক কথা জিদ্ করায়, পিতা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া নিজ পুত্রকে যমকে অর্পণ করিয়াছিলেন। যম নচিকেতার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তিনটি বর দিতে চাহিলেন। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার প্রীতি কামনা করিলেন। দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা জানিতে চাহিলেন। যম এই দুইটি দিলেন। আরও বলিলেন এই অগ্নি 'নচিকেতা অগ্নি' নামেই প্রসিদ্ধ হইবে।

তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয় জানিতে চাহিলেন— যম প্রথমে উহা দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন উহা ছাড়া যাহা চাহিবে তাহাই দিবেন। কিন্তু নচিকেতা অন্য কিছুই লইতে চাহিলেন না। তখন যম তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় জানাইলেন।

এই উপনিষদের প্রতিটি শ্লোকই অতি সুন্দর। আমি তাহার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দিলাম। কিন্তু সবগুলিই পড়া উচিত মনে করি।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ
আশ্চর্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা—
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
কঠঃ ১।২।৭

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥
কঠঃ ১।২।৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
কঠঃ ১।২।১৮

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥
কঠঃ ১।২।২০

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
কঠঃ ১।২।২৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥
কঠঃ ১।৩।১৪

উর্ধ্বমূলোঽবাকৃশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
কঠঃ ২।৩।১

এইভাবে বহু শ্লোকই গীতায় পাওয়া যায়।

প্রশ্নোপনিষদ

ইহাতে প্রশ্ন ও উত্তর এইভাবে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আছে। চতুর্থ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হইল— 'এই পুরুষ শরীরে কাহারা নিদ্রা যান? ইহার উত্তরে স্বপ্নকালের বিষয় বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যা সামান্য মাত্র জানাও সংসারীর পক্ষে অসম্ভব। সর্ব্বত্যাগীরাই চেষ্টা করিতে পারে। কাজেই এ বিষয়ে আর অধিক লিখিলাম না। সংসারী ও অধ্যাত্মজগৎ সম্বন্ধে পরে লিখিয়াছি, তাহা পড়িলে আমার উপরোক্ত কথার মর্ম বুঝিতে পারিবেন।

সংস্কার সহায়ে মন স্বপ্নদর্শন করে; কিন্তু সুষুপ্তিতে নাড়ী-সঞ্চারী ব্রহ্মতেজ ও পিত্তাখ্য সৌরতেজের দ্বারা যখন সংস্কার সমূহের উদ্বোধক ভোগপ্রদ কর্মের পথ রুদ্ধ হয়; তখন মন আর সংস্কারের সাহায্য পায় না। তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনোবৃত্তি সমূহ হৃদয়ে উপসংহৃত হয়। ঐ সময়ে মনে কোনও বিশেষ বিজ্ঞানের উদয় হয় না। মন তখন অবিশেষরূপে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তখন কেবল আত্মার স্বরূপানন্দটি অনুভূত হইতে থাকে—উহাই 'সুষুপ্তি'। এ বিষয়ে আবার লিখিব এবং সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই উপনিষদে প্রাণের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানবান ব্যক্তি ওঙ্কাররূপ প্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্মের অনুগমন করেন।

মুণ্ডকোপনিষদ

ইহাতে পরা ও অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কয়েকটি সুন্দর শ্লোক নিয়ে দিলাম :—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥
মুঃ ১/১/৭

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ॥
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥
মঃ ৩/১/৬

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
নচ প্রমাদাত্তপসে বাপ্যালিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

৩।২।৪

গীতাতেও প্রায় এইরূপ শ্লোক আছে।

মাণ্ডুকোপনিষদ

ওঙ্কার ও প্রণব আত্মা হইতে অভিন্ন, ইহা বুঝান হইয়াছে। (ওঙ্কার সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আবার লিখিব; সেইজন্য এই-খানেই শেষ করিতেছি।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

ইহাতে ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় অনেক কিছু আছে। ইহাতে তিনটি বল্লাধ্যায় আছে ও প্রতি বল্লাধ্যায়ে কয়েকটি করিয়া অনুবাক আছে।

শেষ অনুবাক এইরূপ:—

"আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা। আমি অন্ন ও অন্নভোক্তার মিলন-ঘটক, আমি মিলন ঘটক। আমি প্রথমজ—আমি মূর্তামূর্ত জগতের এবং দেবতাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। আমাতে অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠিত। যিনি অন্নার্থীর নিকট অন্নরূপী আমায় দান করেন, তিনি এই প্রকারেই আমাকে রক্ষা করেন। যিনি অন্ন-দান না করেন তাঁহাকে অন্নরূপী আমি ভক্ষণ করি। আমি পরমেশ্বররূপে জগৎকে শাসন করি। আমার জ্যোতি:সমূহ আদিত্যেরই ন্যায় নিত্য প্রকাশমান" ইহাই পরমাত্ম জ্ঞান। যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার এই ফল হয়।

ঐতেরেয়োপনিষদ

ইহার সর্ব্বশেষ শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ দিলাম।

"এই সর্ব্বভূতস্থ প্রজ্ঞাত্মস্বরূপে এই লোক হইতে উর্দ্ধে গমন করিয়া এবং পূর্ণকাম হইয়া বিদ্বান ইন্দ্রিয়াতীত পরমানন্দধামে অমর হইয়াছিলেন।"

একেবারে শেষে আছে:—

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্; আবিঃ আবীর্ম এধি;" ইত্যাদি—

আবি:=হে প্রকাশক ব্রহ্ম,
আবীএধি=প্রকটিত হও,
মে=আমারি সকাশে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ

ইহাতে যোগের কথা আছে। কিভাবে যোগ অভ্যাস করিতে হয় তাহা দেওয়া আছে।

ব্রহ্মের নানা গুণের কথা বলা হইয়াছে। গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে যাহা আছে, তাহার অনেক কিছুই এই উপনিষদে আছে। অতি সুন্দর ছন্দে পরমেশ্বরের নানা গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে—অতি সুন্দর।

একটি শ্লোক দিলাম—

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভির্বিশ্লোক
এতু পথ্যেব সূরে:।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে
ধামানি দিব্যানি তস্থু:॥

শ্বে: ২।৫

ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ—

ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য পূর্বের শ্লোকে কি আছে জানা প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের জন্য সূর্য্যদেব আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করুন এবং বহির্মুখি ইন্দ্রিয়গণ আত্মাভিমুখি হইয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য একাগ্র করুন। এই ব্যাপক মহান এবং সূর্যদেব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে একত্রে পরমাত্মায় সংযুক্ত করুন। এই প্রকার মহতী স্তুতি করা আবশ্যক।"

এই কথা পূর্বের শ্লোক দিবার পরই উপরোক্ত শ্লোকটি আছে, তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি :—

"(হে ইন্দ্রিয় ও তদানুগ্রাহক দেবগণ) আমি চিত্ত প্রণিধানাদির দ্বারা আপনাদের প্রকাশ্য সনাতন ব্রহ্মে সমাহিত হইতেছি। সবিতা দেবেরই সন্মার্গে স্থিত আমার এই স্তুতি বিস্তৃত লাভ করুক এবং হিরণ্যগর্ভের যে সকল সন্তান দিব্যধামে অবস্থিত আছেন, তাঁহারা ইহা শ্রবণ করুন।

অমৃতস্য = হিরণ্যগর্ভের। বিশ্বেপুত্রা = সন্তানগণ

যে = যাঁহারা। দিব্যানিধামানি = দিব্যধামে

(স্বর্গস্থ অমরাবতী প্রভৃতি স্থান সকলে) আ – তস্থু = আছেন। শৃণ্বন্ত = শ্রবণ করুন।

উপনিষদগুলি পাঠ করিয়া, যাহা সার কথা, নিম্নে দিতেছি :—

ইহাতে তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়।

(১) সর্ব্বেশ্বর বাদের দৃষ্টি – ইতিবাদ – বিশ্বের সমস্তই ব্রহ্মের রূপ।

(২) নেতিবাদী দৃষ্টি—রূপময় জগতের কিছুই ব্রহ্মের নিজস্ব সত্তা নহে। তিনি ইহার অতীত। কিন্তু রূপময় জগৎ তাঁহার শক্তিতেই প্রকাশিত হয়।

(৩) ব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের অতীত হইলেও, জগৎ তাঁহারই সত্তাতেই সত্তাবান। জগতের স্থিতিও তাঁহার মধ্যে। এইমতে ব্রহ্ম জড় ও চৈতন্য যুক্ত এক সত্ত্বা—উহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই, উহারা ব্রহ্মের শক্তি মাত্র।

এইরূপ নানাপ্রকার সামঞ্জস্যের জন্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন রচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু বেদান্তদর্শন পাঠেও বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। পরে অন্যান্য ভাষ্যকারেরা এই উপনিষদগুলি সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উপনিষদগুলির সারাংশ এই যে, ব্রহ্মই সর্ব্বাধাররূপে একমাত্র তত্ত্ব। তাঁহার অন্তর্গত দুইটি শক্তি চৈতন্য ও রূপ গ্রহণের উপাদান। এই দুই শক্তি ব্রহ্মের ইচ্ছা ও নিয়মের অধীন। ব্রহ্মের ইচ্ছাতে এই দুই শক্তির মিলনে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। মিলন বলিতে ইহাই বুঝায় যে চৈতন্য-শক্তির সাহায্যেই উপাদান শক্তি সক্রিয় হয়। গীতায় চৈতন্য শক্তিকে ঈশ্বরের পরা-প্রকৃতি এবং উপাদান শক্তিকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ছাড়া আর কোনও উপনিষদে 'ঈশ্বর' নাম আমার চোখে পড়ে নাই।

ব্রহ্ম যখন তাঁহার দুই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও লয় করেন, সেই অবস্থাকেই পরের যুগের ঋষিগণ 'ঈশ্বর' আখ্যা দিয়াছেন। ঈশ্-

ধাতুতে 'অ' প্রত্যয় করিয়া 'ঈশ্বর' হইয়াছে। ইহার অর্থ যিনি সতত ইচ্ছা করেন।

এবারে আমাদের নিজের কথা বিচার করিয়া দেখি। আমাদের দুইটি দেহ, স্থূল ও সূক্ষ্ম। ইহারা দেহের উপাদান শক্তি। প্রাণই চৈতন্য শক্তি। যদিও প্রাণের অভাবে উপাদান শক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তথাপি উপাদান শক্তি ও প্রাণশক্তি উভয়েই 'আমি বোধ' রূপ আত্মার অধীন। যদিও উপাদান শক্তি প্রাণশক্তির অধীন, কিন্তু তাহা উপাদান শক্তিকে সক্রিয় করা অবধি, তার বেশী নয়। সব কিছু 'আমি বোধ' রূপ আত্মার ইচ্ছাধীন।

আমাদের অহংকার এই 'আমি বোধ' হইতেই উদয় হয়। উহা একপ্রকার মানসিক খণ্ডিত ভাব। নিজ কর্ম্ম করাইয়া লইয়া আবার পূর্ণ 'আমি বোধে' লয় হয়। এই 'আমি বোধ' আত্মাই তাহাদের অধিষ্ঠান সত্তারূপে তাহাদিগকে রক্ষা এবং ইচ্ছামত পরিচালনা করে।

উপরোক্ত আলোচনা এই পর্য্যন্তই আপাততঃ থাক, কারণ বুঝিতে কষ্ট হইবে। আরও অগ্রসর হইলে বুঝার সুবিধা হইবে, তখন আবার আলোচনা করিব।

—**—

জীব

যে বস্তুতে (স্থূল বা সূক্ষ্ম), প্রাণ আছে, তাহাকেই জীব বলে। ব্রহ্ম অনন্ত, কাজেই ব্রহ্মের বাহির বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। বিশ্ব ও জীব ব্রহ্মেরই আশ্রিত।

উপনিষদের মতে জীব অসৃষ্ট এবং সতত বর্ত্তমান, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের বিশ্বরূপ দেহেই থাকে। চেতন মনোময়রূপে সূক্ষ্ম বিশ্বের সহিত একাকারবৎ হইয়া থাকে। বিশ্ব স্থূলরূপ ধারণ করিলে জীবগণের স্থূলরূপ ধারণ সম্ভব হয়। বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে জীবের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। কিন্তু জগৎ সৃষ্টির পর সৃষ্ট পদার্থের গ্রহণ-বর্জনরূপ ব্যবহারমূলক কর্ম্মে জীবের স্বাধীনতা আছে। সত্তায় জীব অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে 'অণু' বলে। এই অণু আকারে জীব অনাদি, অজর, অমর ও নিত্য বর্ত্তমান।

"বালাগ্র-শত-ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

শ্বেতাঃ ৫/৯

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কার সমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্ম গুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ।"

শ্বেঃ ৫।৮

বঙ্গানুবাদ :—যে জীব জ্যোতিঃ স্বরূপ, যিনি হৃদয় গুহায় অবস্থান হেতু অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বলিয়া প্রতিভাত, এবং যিনি সঙ্কল্প ও অহঙ্কার বিশিষ্ট তাহারই উপর বুদ্ধির গুণসমূহ অধ্যাস্ত হওয়ায় ঐ গুণগুলি আত্মার গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং তজ্জন্য জীব গোতাড়ন শলাকার অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশিষ্ট এবং অপকৃষ্ট অনুভূত হন।"

অন্তঃকরণে উপহিত বা অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। জীবের উপাধিভূত লিঙ্গ শরীর অতি সূক্ষ্ম বলিয়া জীবকে 'অণু' বলে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবের নাশ নাই। মৃত্যুতে একটি দেহের রূপ নষ্ট হইয়া গেলে জীব তাহার ভোগ ও কর্ম্মের জন্য পুনরায় আবশ্যক মত স্থূল দেহ নির্ম্মাণ করে। দেহটি তাহার আবরণ মাত্র।

উপনিষদ মতে জীবসমূহ তাহাদের কর্ম্মের জন্য দায়ী ও কৃত-কর্ম্মের ফলও ভোগ করে। জীব সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্তই থাক। ইহার বেশী জানিবার জন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ও বেদান্ত পড়িতে হইবে। ঠিকরূপে 'জীব' কি তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন; শুধু পুস্তক পড়িলেই বুঝা যাইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত কর্মের ফলে জীব মূল উপাদান শক্তি হইতে বর্ত্তমান দেহ নির্ম্মাণ করে।

সাধারণে প্রশ্ন করিবে, জীব কি আত্মা হইতে পৃথক্? 'আত্মা' কিছু করে না, অথচ বলিতেছি জীব দেহ নির্ম্মাণ করে। সেই কারণেই উক্ত পুস্তকগুলি পড়িয়া তারপর বিচার দ্বারাই এই প্রকার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গ্য — অজাতশত্রু কথোপকথনে এ বিষয়ে অনেক কিছু দেওয়া আছে। আমিও ক্রমে এই জিনিষই সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। সর্ব্বত্র বিদ্যমান। প্রাণশক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান নহে। যে বস্তুতে প্রাণশক্তি থাকে তাহাই জীব। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

—**—

প্রণব মন্ত্র 'ওঁ'

ওঙ্কার তিনটি অক্ষর=অ, উ, ম।

ওঙ্কার হইতেছে অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাচক।

অ=আনন্দ, উ=চৈতন্য, ম=সৎ

অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দ্যোতক। ওঙ্কার আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তাই ওঙ্কার ব্রহ্মচিন্তার দ্যোতকরূপে জানি। এইগুলি উপনিষদের অতি সূক্ষ্ম কথা।

আরও স্থূলভাবে অ=বিষ্ণু—সত্ত্বগুণ; উ=ব্রহ্মা—রজোগুণ, এবং ম=রুদ্র—তমগুণ। ইহা বেদমন্ত্রের শাশ্বত বীজ।

"এতৎ অক্ষরং অমৃতং অভয়ং তৎপ্রবিশ্য দেবা
অমৃতা অভয়া অভবন্"

ছা—১।৪।৪

"ব্রহ্মের হৃদাকাশ হইতে নাদ, নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার, ওঙ্কার অব্যাকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎবাচক্" (ভাগবতে কি আছে তাহা আবার লিখিব)

শ্রীমদ্ভাগবত্।

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।

প্রঃ ৫।২

এই তিনের ব্যক্তরূপ "ওঁ তৎ সৎ"

ওঁ=ব্রহ্ম, তৎ=জীব, সৎ=জগৎ

'তৎ' ও 'সৎ' ব্রহ্মের উপাধি। ইহাদিগকে ব্রহ্মের শক্তিও বলে।

অন্তঃকরণে উপহিত বা অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। জীবের উপাধিভূত লিঙ্গ শরীর অতি সূক্ষ্ম বলিয়া জীবকে ‘অণু’ বলে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবের নাশ নাই। মৃত্যুতে একটি দেহের রূপ নষ্ট হইয়া গেলে জীব তাহার ভোগ ও কর্ম্মের জন্য পুনরায় আবশ্যক মত স্থূল দেহ নির্ম্মাণ করে। দেহটি তাহার আবরণ মাত্র।

উপনিষদ মতে জীবসমূহ তাহাদের কর্ম্মের জন্য দায়ী ও কৃতকর্ম্মের ফলও ভোগ করে। জীব সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্তই থাক। ইহার বেশী জানিবার জন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ও বেদান্ত পড়িতে হইবে। ঠিকরূপে ‘জীব’ কি তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন; শুধু পুস্তক পড়িলেই বুঝা যাইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত কর্মের ফলে জীব মূল উপাদান শক্তি হইতে বর্ত্তমান দেহ নির্ম্মাণ করে।

সাধারণে প্রশ্ন করিবে, জীব কি আত্মা হইতে পৃথক্? ‘আত্মা’ কিছু করে না, অথচ বলিতেছি জীব দেহ নির্ম্মাণ করে। সেই কারণেই উক্ত পুস্তকগুলি পড়িয়া তারপর বিচার দ্বারাই এই প্রকার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গ্য — অজাতশত্রু
কথোপকথনে এ বিষয়ে অনেক কিছু দেওয়া আছে। আমিও ক্রমে এই জিনিষই সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। সর্ব্বত্র বিদ্যমান। প্রাণশক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান নহে। যে বস্তুতে প্রাণশক্তি থাকে তাহাই জীব। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

—**—

প্রণব মন্ত্র ‘ওঁ’

ওঙ্কার তিনটি অক্ষর=অ, উ, ম।

ওঙ্কার হইতেছে অনির্দ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাচক।

অ=আনন্দ, উ=চৈতন্য, ম=সৎ

অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দ্যোতক। ওঙ্কার আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তাই ওঙ্কার ব্রহ্মচিন্তার দ্যোতকরূপে গণ্য। এইগুলি উপনিষদের অতি সূক্ষ্ম কথা।

আরও স্থূলভাবে অ=বিষ্ণু—সত্ত্বগুণ; উ=ব্রহ্মা—রজোগুণ, এবং ম=রুদ্র—তমগুণ। ইহা বেদমন্ত্রের শাশ্বত বীজ।

“এতৎ অক্ষরং অমৃতং অভয়ং তৎপ্রবিশ্য দেবা
অমৃতা অভয়া অভবন্”

ছা—১।৪।৪

“ব্রহ্মের হৃদাকাশ হইতে নাদ, নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার, ওঙ্কার স্বপ্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎবাচক্” (ভাগবতে কি আছে তাহা আবার লিখিব)

শ্রীমদ্ভাগবত্।

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।

প্রঃ ৫।২

এই তিনের ব্যক্তরূপ “ওঁ তৎ সৎ”

ওঁ=ব্রহ্ম, তৎ=জীব, সৎ=জগৎ

‘তৎ’ ও ‘সৎ’ ব্রহ্মের উপাধি। ইহাদিগকে ব্রহ্মের শক্তিও বলে।

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"

গীতা : ১৭।২৩

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত ।
ওমিতিহ্যুদ্‌গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্

ছাঃ ১।১।১

ছান্দোগ্যোপনিষদে এই শ্লোকটির পর ওঙ্কারের উপাসনা, মহিমা ও ফল ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা জানিলাম যে, ওঙ্কার শব্দে জগৎ, জীব ও ঈশ্বর বুঝায়। গীতার ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম বুঝায়। বেদান্তে সৎ, চিৎ আনন্দ বুঝায় এবং কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বুঝায়।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি
তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে—ওঁ ইতি এতৎ ॥"

কঠঃ ১।২।১৫

স্ফোট

সমাধি অবস্থাপন্ন পরমেষ্টি ব্রহ্মার হৃদয় আকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইল। অতঃপর সেই নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল। তাহা সপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎবাচক শব্দ এবং সমস্ত বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। প্রথমতঃ সেই অব্যক্ত ওঙ্কারের অকার, উকার, মকার এই তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল

এবং উহা হইতে ক্রমশঃ সত্ত্বাদিগুণ, ঋগ্বেদ, ভূর্ভুবাদি লোক অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি হইল।

ভাগবত—১২।৬-৩৫-৩৭

নিম্নলিখিত উপনিষদগুলিতে ওঙ্কার সম্বন্ধে অনেক তথ্য দেওয়া আছে :

(১) একাক্ষর উপনিষদ—১।৫, (২) মুণ্ডক—২।২।৬,
(৩) মাণ্ডুক্য—১।১-১২, (৪) কঠ—১।২।১২-১৭
(৫) নৃসিংহোত্তর তাপনীয়—১।১, ৩।১, ৪।১ (৬) প্রশ্নঃ—৫।৫,
৭) তৈত্তিরীয়—১।৫ ।

মুক্তি

উপনিষদে মুক্তির বিস্তারিত কোনও বর্ণনা আমি পাই নাই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা অনেক আছে। তত্ত্বের জ্ঞান লাভই মুক্তি বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা"

—পঞ্চদশী

"এ জীবনেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়
তবে কৃতকৃত্যতা হয়।"

কেন : ২।৫

ব্রহ্মকে যিনি জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন।

মুণ্ডক : ৩।২।৯

মুক্তি সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্তই থাক, ঠিক সময় মত আবার

আলোচনা করিব। সঠিকভাবে বুঝিবার জন্য আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

আমি এখন উপনিষদের কথাই আলোচনা করিতেছি; কাজেই আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের মধ্যে যাহাতে ভুলবশতঃ চলিয়া না যাই, সেই-জন্য সব কিছুই সংযতভাবে লিখিতে হইতেছে। ঋষিরা 'ছক্' বাঁধিয়া দিয়াছেন —মোক্ষশাস্ত্র বেদান্ত--ইহার বাহিরে একটি কথাও বলা চলিবে না — নিজের বুদ্ধি প্রয়োগের প্রশ্নই আসে না—'ক্ষুরস্য ধারা'।

—::—

গায়ত্রী মন্ত্র

উপনিষদে গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমার কথা অনেক বলা হইয়াছে।

গায়ত্রী মন্ত্র :

"ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্য
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ
প্রচোদয়াৎ"

যে সাধক গায়ত্রী মন্ত্রের এই তাৎপর্য্য পূর্ণরূপে অবগত হইয়া সাধনা করেন তিনি সর্ব্বপ্রকার শক্তি ও যশ লাভ করিয়া সূর্য্যের মত দীপ্তিবান্ হন।

বৃহঃ ৫।১২।৩

গায়ত্রী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিতা

বৃহঃ - ৫।১৪।৪

তান্ত্রিক গায়ত্রী আবার অন্যরূপ ; যথা :

দক্ষিণকালিকার গায়ত্রী :—

"কালিকায়ৈ বিদ্মহে, শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি।
তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥"

এইরূপ প্রত্যেক দেব-দেবীর এক এক প্রকার গায়ত্রী আছে। গায়ত্রীকে 'বেদমাতা' বলা হয়। এই মন্ত্রে সূর্য্যকে ধ্যান করিতে হয়। বৈদিক গায়ত্রীর অর্থ — সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই সূর্যমণ্ডল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। দেবী-রূপে এই সবিতা ব্রহ্মার স্ত্রী এবং বেদমাতা। গায়ত্রী তাঁহার গীতকারীদের ত্রাণ করেন বলিয়া গায়ত্রী নামে অভিহিতা।

মায়া ও ত্রিগুণ

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা কাল ও জীব প্রভৃতি নিখিল কারণকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, সেই দেবের স্ব-আত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকেই ব্রহ্মবাদিগণ সমাধি সহায়ে পরমাত্মার জগৎকারণত্বের সহায়রূপে দর্শন করিয়াছিলেন"

—শ্বেঃ ১।৩

"ব্রহ্মা মায়াশক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই জগতে অবিদ্যা দ্বারা জীবরূপে বদ্ধ হন।"

—শ্বেঃ ৪।৯

যাহা সংসার গতির কারণ তাহাই অবিদ্যা।
প্রকৃতি মায়া, পরমেশ্বর মায়াধীশ॥

—শ্বেঃ ৪।১০

মায়া ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতি জাত। এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে।

—গীতঃ ১৪।৫

সত্বগুণের ধর্ম্ম সুখ ও জ্ঞান। রজগুণের ধর্ম্ম, রাগত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি উহা হইতে উৎপন্ন হয়। উহা কর্ম্মশক্তির দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে।

তমগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদ (কর্ত্তব্যমূঢ়তা) উৎপন্ন করে।

এই তিনগুণ একত্র থাকে। তমোগুণ প্রবল হইলে নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্যাদি উৎপন্ন হয়। ইহার প্রবলতা পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ অদৃষ্টবশে হইয়া থাকে।

এই গুণত্রয়ের বর্ণনা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে, সেজন্য আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি না। যদি প্রয়োজন বোধ করি তাহা হইলে এ বিষয়ে আবার লিখিব।

—**—

কপিল সাংখ্য দর্শন

এইমতে সংসার দুঃখময়, জীব ত্রিবিধ তাপে তাপিত। এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। এই দুঃখ নিবৃত্তের একমাত্র উপায় জ্ঞান। প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞান — ইহাকে বলে "পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের" জ্ঞান। সাংখ্য মতে মূলতত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্ম নহেন। মূল-তত্ত্ব দুই, পুরুষ ও প্রকৃতি; উভয়ই অনাদি, নিত্য। প্রকৃতি জড় গুণময়ী পরিণামিনী, প্রসবধর্ম্মিনী অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টি সামর্থ্যা। পুরুষ চেতন, নির্গুণ, অপরিণামী, অকর্ত্তা, উদাসীন, সাক্ষী মাত্র। পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগেই সৃষ্টি, এই দুঃখময় সংসার। মহর্ষি কপিল সাংখ্য মতের প্রবর্ত্তক।

ইনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে. প্রথমে কিছু না থাকিলে, অকস্মাৎ অমনি কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না।

যেমন মাটি হইতে ঘট ইত্যাদি। প্রকৃতি নিত্য এবং ইহার বিকার দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপার উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই মূল। কপিল ইহাকে অমূল-মূল বলিয়াছেন। সেই আদি কারণ হইতেই ক্রমশঃ কার্য্য পরম্পরায় এই বিশ্ব ব্যাপারের উৎপত্তি বলিয়া কপিল ইহার নাম দিয়াছেন 'প্রকৃতি'। কপিলের এই তন্ত্রনাম্নী স্মৃতি শিষ্টগণের মান্য। অনেক ঋষি কপিলের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ প্রভৃতি কতিপয় ঋষির স্মৃতিও কপিল স্মৃতির অনুমত। এক শ্রুতি কপিলকে মহাজ্ঞানী বলিয়াছেন। কপিল আত্মভেদ অর্থাৎ নানা আত্মা স্বীকার করেন। ইহা বেদ অনুযায়ী শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সাংখ্য স্মৃতিতে আছে প্রকৃতির পরিণাম মহৎ ও অহঙ্কার। যদিও কোন কোন শ্রুতিতে মহৎ-শব্দের শ্রবণ আছে, তাহা সাংখ্যোক্ত মহতের বোধক নহে। সাংখ্যশাস্ত্রের অপর নাম ষষ্টিতন্ত্র।

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

পুরুষ (১) প্রকৃতি (১)

|

বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব (১)

|

অহঙ্কার (১)

সত্বগুণের প্রাবল্যে — তমোগুণের প্রাবল্য

(৫) জ্ঞানেন্দ্রিয় — (১) মন

| — (৫) তন্মাত্র

চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। — |

(৫) কর্ম্মেন্দ্রিয় — (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ)

| — (৫) স্থূলভূত

(হস্ত পদ পায়ু বাক্ উপস্থ) — |

বা/মলদ্বার বা/লিঙ্গদ্বার (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)

ইহাকেই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব বলে। এইজন্যই ইহাকেই দ্বৈতবাদী বলে।

এই ২৫টি তত্ত্বের মধ্যে মূল প্রকৃতি এক। ইহাতে বিকৃত হইয়াছে ৭টি প্রকৃতি-বিকৃতি—১ মহত্তত্ত্ব, ১ অহঙ্কার, ৫ তন্মাত্র। এই সাতটিও প্রকৃতি কারণ হইতে ১৬টি তত্ত্ব বিকৃত হইতেছে; ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ১ মন এবং ৫ স্থূলভূত। এই ১৬টি হইতে আর কোনও তত্ত্ব বিকৃত হয় নাই। পুরুষ অপ্রকৃতি ও অবিকৃতি, ইনি স্বতন্ত্র, উদাসীন। প্রকৃতি বিকৃতি শূন্যঃ।

তিনগুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও ২৩টি বিকার (পুরুষ ও প্রকৃতি বিকার নহেন) প্রকৃতি হইতে জাত। ইহাদের কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির।

পুরুষ স্বতন্ত্র, উদাসীন গুণাতীত, কিন্তু প্রকৃতি সান্নিধ্যবশতঃ গুণময় হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে। পুরুষ 'চেতন' হইলেও নির্বিকার, অকর্তা।

প্রকৃতি জড়া কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে চৈতন্যের আভাস হয়।

সৃষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতি সংযুক্ত থাকে; তাহার ফলে প্রকৃতিতে পুরুষের চৈতন্য পুরুষে প্রকৃতির গুণের আভাষ উপরচিত হয়।

সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধই নাই। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই জ্ঞান। এখানে ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই, তাই ইহা নিরীশ্বরবাদ। ইহা সর্ব্বস্ব ত্যাগের ব্যাপার।

নিরীশ্বর সাংখ্য ব্যতীত সকল শাস্ত্রেই বলেন প্রকৃতি বা মায়া ঈশ্বরের শক্তি। তন্ত্র শাস্ত্রে এই শক্তিই 'ঈশ্বরী'। সাংখ্যের পুরুষ

শিব-শয়ান নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, দ্রষ্টা, সাক্ষী ও অনুমন্তা, আর তাঁহার সম্মুখে বিশ্বলীলার নৃত্যপরা ক্রীড়াশীলা প্রকৃতিই 'কালী' বেদান্তের ভাষায় এই শক্তিই পরমব্রহ্মের স্পন্দন শক্তি। স্পন্দন মায়া।

ব্রহ্মশক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধ—(১) জ্ঞানশক্তি বা সাত্ত্বিকী মায়া তাহার বৈষ্ণবী শক্তি (লক্ষ্মী)

(২) ইচ্ছাশক্তি রাজসী মায়া আদ্যাশক্তি।

(৩) ক্রিয়াশক্তি বা তমসী মায়া রৌদ্রশক্তি।

এই ত্রিবিধশক্তি দ্বারা মহামায়া জগন্ময়ী জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য্য করিতেছেন।

সৃষ্টিতে শক্তির অনন্ত বিকাশ—আদ্যাশক্তির নানা মূর্ত্তি, নানা বিভাগ। ইনি ভোগে ভবানী, সমরে সিংহবাহিনী দুর্গা, জগৎ-রক্ষায় জগদ্ধাত্রী এবং প্রলয়ে করালকালী।

এ বিষয়ে আবার আলোচনা করিব যখন শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা বলিব।

গীতায় প্রকৃতি ২ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে — অপরা ও পরা। ৮টি অপরা প্রকৃতি।

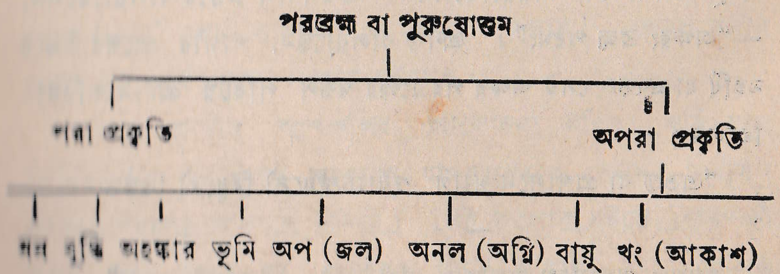

ভূমি রাপোহনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। গীতা : ৭।৪

মহতত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব কি তাহা একটু বুঝাইয়া বলিতেছি : কোনও কাজ করিবার পুর্ব্বে সেই কাজ করিবার বুদ্ধি বা সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয়। কি কাজ, কেন করিব, কিভাবে করিব এই সকলই বুদ্ধির ব্যাপার। সেইরূপ প্রকৃতির সাম্যভাব ভাঙ্গিয়া স্বকীয় বিস্তারের জন্য বুদ্ধি হওয়া চায়। সেইজন্য প্রথমেই বুদ্ধিরূপ গুণের উৎপন্ন হয়। বেদান্ত মতে 'বুদ্ধি' ঐশী মায়ার পরিণাম "ঈক্ষণ" এবং অহঙ্কার সঙ্কল্পরূপে বলা হইয়াছে। সাংখ্য মতে প্রকৃতির বিকার বা পরিণাম বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার। বেদান্ত মতে উহারা সগুণ ব্রহ্মের সঙ্কল্প ও সৃষ্টির ইচ্ছা (ঈক্ষন) মাত্র। বেদান্ত মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র উহা ব্রহ্মের বিকার নহে।

(বিবর্ত্ত=যথা, সর্পে রজ্জু ভ্রম। এখানে সর্প মিথ্যা। বিকার= পরিণাম, মাটির বিকার ঘট। এখানে মাটি ও সত্য ঘট ও সত্য; কিন্তু ঘট ও মাটি।

আরও এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিব যখন শ্রীশ্রীগীতার কথা বলিব।

এখানে বেদের কথা কিছু বলিতেছি :— ব্রহ্ম কি? এই প্রশ্ন অর্জ্জুন ভগবানকে করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান উত্তরে বলিয়াছিলেন, —"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং"। শ্রুতি বলিয়াছেন, গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই অক্ষর পরব্রহ্মের স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন :—

"এতস্য বা প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত

— — — — — — —

মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ"

বঙ্গানুবাদ : হে গার্গি। এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য্য, চন্দ্র

বিধৃত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অক্ষর বস্তুরই বিশিষ্ট আজ্ঞায় দ্যুলোক এবং ভূলোক সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। এই অক্ষর সদ্‌বস্তুর প্রকৃষ্ট নিধানে নিমেষ, মুহূর্ত্ত দিবা, নিশা, পক্ষ, মাস, ঋতু এই ক্রমে বর্ষ সমূহ পরিপুষ্ট হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে।

এই সদ্‌বস্তুর অনুশাসনে বাক্য, মনুষ্যগণ, দাতৃগণ, দেবগণ— যজমানগণকে, পিতৃগণ দর্বীকে প্রশংসা করিয়াছেন এবং পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন।

আরও বলিয়াছেন, তিনি যজ্ঞফল প্রদানকারী। যাহা সৎকর্ম্ম— যাহা নিষ্কাম কর্ম্ম— তাহাই যজ্ঞকর্মের দ্যোতক। তিনি উপদেশ দিয়াছেন, সকল কর্ম পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু যজ্ঞ, দান, তপ কদাচ পরিত্যাগ করিও না। যজ্ঞ দান ও তপ দ্বারা মনীষিগণ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন।

"ঋগ্বেদে সোম"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্ত দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত অতি প্রাচীন অংশ বাকী অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাঁহারা বলেন প্রাচীন অংশে 'সোম' অর্থে সোমলতা বা সোমরস বুঝায়। কেবল নবীন অংশে চন্দ্র অর্থে 'সোম' ব্যবহার হইয়াছে।

এখানে প্রাচীন অংশগুলির আলোচনা করি। ঋষি যাস্ক লিখিয়াছেন, দেবনিবাস আকাশে বা দ্যুলোকে সোমের নিবাস। সোমের পরমপদ আকাশে বর্ত্তমান। সেই দ্যুলোক হইতে শ্যেনপক্ষী কর্তৃক সোম আহৃত হয়। এইরূপ প্রবাদ ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল। সোম সঙ্কেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন করেন।

দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ইনি চতুর্দ্দিকে গমন করেন। আকাশ হইতে তাঁহার কিরণ যেন সহস্র সহস্র ধারায় পৃথিবীতে বর্ষিত হয়; এজন্য তিনি প্রার্থিত হন। সোমের গমন পথ অতি বিশাল। সেই বিস্তীর্ণ মার্গে গমনশীল সোম, প্রভাত, স্বর্গ ও কিরণ দান করে। এই সকল হইতেই বুঝা যাইতেছে যে 'সোম' চন্দ্র অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সোম সম্বন্ধে বহু গবেষণা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্য্যগণের দেব উপাসনার বিবিধ উপকরণ সামগ্রীর মধ্যে 'সোমরস' পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সোমরস কি?

কাহারও কাহারও মতে, সোমরস এক প্রকার লতা হইতে প্রস্তুত করা হইত। সেই লতা পাহাড়ে পর্ব্বতে জন্মাইত। ঋত্বিকেরা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সোমলতা আহরণ করিতেন। পাষাণে উহার কণ্ডন কার্য্য হইলে উহা হইতে রস নির্গত হইত। তৎপরে রস ছাঁকিয়া ঋষিগণ পবিত্র যজ্ঞপাত্রে রাখিতেন এবং যথাকালে দেবতাগণকে অর্পণ করিতেন। প্রাতঃসবন, মাধ্যসবন ও তৃতীয়-সবন এই যজ্ঞত্রয়ে সোমরস বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত। সোমরস আর্যগণের অত্যন্ত প্রীতির বস্তু ছিল। তাঁহাদের সোম প্রস্তুত করণের নাম ছিল "সোমভিষব বা সোমকণ্ডন"। উদুখল ও মূষলে সোমলতা কণ্ডন করা হইত। Max Mular-এর মতে সোমলতা হিমালয়ের উত্তরে মধ্য এশিয়ার পর্ব্বত সমূহে উৎপন্ন হইত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সোমরস এক সুরা-বিশেষ বলিয়াছেন। বেদে এবং পারসীকগণের জেন্দ-আভেস্ত গ্রন্থে সোমলতা সম্বন্ধে যে বিবরণ দৃষ্ট হয় তাহাতে ইহাকে সুরা বলিয়া প্রমাণিত হয় না। জেন্দ-

আভেস্তে সোমলতা (হোম) প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, সোমলতা বৃক্ষাদির প্রাণস্বরূপ, ইহা সর্ব্বরোগনাশক এবং অমরত্ব বিধায়ক।

Max Muller, Dr. Spigal, Madam Blavatski প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সোমলতাকে জেন্দ-আভাস্তের "হোম" ও বাইবেলের "Tree of life" বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন সোমলতা 'পুঁইশাক'। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ, দেবতারা পুঁইশাকের রস খাইতে আগ্রহ দেখাইবেন, তাহা হইতেই পারে না। সোমরস এরূপ দুষ্প্রাপ্য, সুমিষ্ট ও সুন্দর পানীয় দ্রব্য ছিল যে তাহা দেব পূজার উপকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরা হইত।

পৃথিবীর বহু জিনিষ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই সোম-রসের মত বস্তু যে অন্তর্হিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি সোমরস সুরাই হয় তাহা হইলেও সে সুরা পৃথিবীতে নাই। আমরা রামায়ণ মহাভারতে সোমরসের উল্লেখ পাই না। কাজেই উহা উধাও হইয়াছে বহুযুগ আগেই।

স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র

বৈদিক যুগে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধি নিয়মাদি সংক্ষিপ্ত ভাবে সঙ্কলিত করিয়া বিবিধ সূত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদিগকে 'কল্পসূত্র' বলে। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত :—

(১) শ্রৌতসূত্র=শ্রৌত্র যজ্ঞের বিবরণ।

(২) গৃহ্যসূত্র=গৃহ্য অনুষ্ঠানের বিবরণ।

(৩) ধর্ম্মসূত্র=পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মকর্ম্মের বিবরণ।

(১) এবং (২) এই দুইটি লুপ্ত। প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রগুলি অধিকাংশই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধর্ম্মসংহিতা নাম ধারণ

করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্ম্মসূত্র ও মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, পরাশর, দক্ষ প্রভৃতি ২০টি ধর্ম্মসংহিতা পাওয়া যায়। ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। সংহিতাগুলির মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য।

রামায়ণ

বেদ-বেদান্তই ভারতের সর্ব্ব পুরাতন গ্রন্থ। তারপর আমরা যাহা পাই তাই বাল্মীকি রামায়ণ। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের লেখা রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের মত ঠিক নয়। কাশীরাম দাস রচিত বাঙ্গলা রামায়ণও অনুরূপ।

মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সম্বন্ধে সব কিছু শুনিলেন। তারপর তিনি ভাগীরথীর অদূরে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তীরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কানন সমীপে এক ক্রৌঞ্চ মিথুন মধুস্বরে গান করতঃ সুস্থ শরীরে বিহার করিতেছিল। এই অবসরে এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মহর্ষি বাল্মীকি বিহঙ্গকে ব্যাধ কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন; এবং তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কাজ অত্যন্ত অধর্ম্মজনক জ্ঞান করিয়া একটি 'শ্লোক' কহিলেন,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

অর্থাৎ, "রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস্; অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিবি না"।

এই অভিশাপ দিয়াই, তিনি এই শ্লোক বারবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শিষ্য ভরদ্বাজকে বলিলেন যে, আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ, অক্ষরবৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক উপযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে কথিত হউক। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া যখন এ শ্লোকের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিলেন, তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়া বিখ্যাত হইবে; আমার সঙ্কল্প প্রভাবেই এই শ্লোক তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে; অতএব তুমি এখন সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ তদনুসারে ধর্ম্মশীল, গম্ভীর স্বভাব, বুদ্ধিমান্ রাম এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

তখন মহর্ষি বাল্মীকি ঐ প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

রঘুকুলপতি রাম রাজ্যলাভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি রামচরিত সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্য মধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক, পাঁচ শত সর্গ ও ছয় কাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ডে অবস্থিত আছে। উত্তরাকাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভে প্রবেশ পর্যন্ত আছে। মহর্ষি বাল্মীকি এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তাঁহার শিষ্যদ্বয় মুনিবেশধারী জানকীনন্দন লব ও কুশ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মহর্ষি বাল্মীকি লব ও কুশকে

সমস্ত রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। লব ও কুশ শীঘ্রই সেই উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তাপস ও সাধু সমাজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যায় রাজমার্গে রামায়ণ গান করিতেছেন এমন সময় রাজা রাম তাহাদিগকে দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে রাজসভায় আনাইয়া তাহাদের মুখে রামায়ণ গান শুনিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন ঐ ভ্রাতৃদ্বয় সীতার গর্ভজাত। তখন তিনি সীতাকে আনিবার জন্য বাল্মীকির নিকট দূত পাঠাইলেন। বাল্মীকি সীতাকে লইয়া সভা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাল্মীকি সীতার চরিত্রের সম্বন্ধে বলিলেন। সীতার শপথ প্রসঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মা, সুরগণ, আদিত্যগণ, রুদ্রগণ ইত্যাদি সকলে আগমন করিলেন। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, "আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি, তবে এই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিব। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিব"।

জানকী এরূপ শপথ করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দেবী পৃথিবী বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক জানকীকে লইয়া সিংহাসনে বসিলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। মাতা পৃথিবীর গর্ভে সীতার প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত হইল।

উত্তরাকাণ্ডের শেষ শ্লোক নিম্নে দিলাম :—

"সীতা প্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্তমিবাতর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥"

রামায়ণের কাহিনী অল্প-বিস্তর সকলেরই জানা আছে, কাজেই এখানে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন বোধ করি না। আমার অভিজ্ঞতায় যতটুকু দেওয়া দরকার তাহা দিলাম। তুলসীদাস রচিত রামায়ণ সম্বন্ধে কিছু বলিব :—

আমরা চারটি রামায়ণের কথা জানি :—

(১) মহর্ষি বাল্মীকি রচিত মূল সপ্তকাণ্ড রামায়ণ,

(২) তাঁহারই রচিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ,

(৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অন্তর্গত মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অধ্যাত্ম রামায়ণ ও

(৪) তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানস বা তুলসী-রামায়ণ।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ :— পরমাত্মা বিষ্ণু দেবগণের দুঃখ মোচনের জন্য, দেবতাগণকে বর প্রদান করিয়া রামরূপে জন্ম লইলেন। এ সম্বন্ধে পরে সময়মত আবার বলিব।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ :—জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রকরণে মহর্ষি বাল্মীকি রাজর্ষি অরিষ্টনেমিকে অখণ্ডিত রামায়ণ উপদেশ দ্বারা বুঝাইলে তাহার জীবন্মুক্তির স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে, তিনি প্রশ্ন করিলেন, —রাম কে? তিনি কেমন? তিনি বদ্ধ না মুক্ত? তিনি কোন্ নাম? ইত্যাদি প্রশ্ন। এই রামায়ণেও বাল্মীকি তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজকে ইহা বলিয়াছিলেন ইহাই 'উত্তরখণ্ড'।

অধ্যাত্ম রামায়ণ :—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মহর্ষি বেদব্যাস রামলীলা ও রামতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। মূল রামায়ণে শিব-ভবানীর প্রসঙ্গ নাই বলিলেই হয়। বিশ্বামিত্র মুখে রামের জনকপুর যাত্রা প্রসঙ্গে সামান্য বলা হইয়াছে।

তুলসীদাস রচিত রামায়ণ শিব-ভবানী উপাখ্যান লইয়াই আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ভক্তির সাগর। তিনি লিখিয়াছেন রাম নাম জপ করিলে যোগীর হৃদয়ে আত্মা জাগ্রত হয়, প্রপঞ্চের নাশ হইয়া বৈরাগ্য উদয় হয়; ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়। আত্মাকে জানিতে রাম নামই যথেষ্ট। রাম নাম লইলে সব দুঃখের অবসান হয়।

ইহাতে আছে প্রথমে শিব-উমার বিবাহ; বিবাহের পর শিব উমাকে লইয়া দীর্ঘদিন কৈলাসে কাটান।

রামতত্ত্ব শিব উমাকে বলিয়াছিলেন। তাহা আবার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্য ভরদ্বাজকে বর্ণনা করেন। উমা শিবকে বলিলেন "তুমি আমায় রঘুনাথ তত্ত্ব কহিয়া আমার সকল অজ্ঞান দূর কর। আমি কল্পতরুতলে বাস করিয়া দারিদ্র্যদুঃখ সহিব ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা। তুমি আমার ভ্রম দূর কর। পরমার্থবাদী মুনিগণ রামকে পরমব্রহ্ম ও অনাদি বলিয়া ঘোষণা করেন। আনন্দদেব, সরস্বতী, বেদ-পুরাণ সকলেই রাম গুণগান করেন। তুমিও দেখি অহোরহঃ রামনাম জপে রতঃ। অযোধ্যা রাজপুত্র কি সেই রাম? যদি সর্ব্বব্যাপী চেষ্টাহীন বিভু আর কেহ থাকেন তাহাও বুঝাইয়া দাও; সেইভাবে রামতত্ত্ব বুঝাইয়া দাও যে অনুভূতি হইলে মুনি জ্ঞানী সকলে ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান বৈরাগ্য বিচার করিয়া রামে লীন হন।"

শিব রাম নামের গুণগান করিয়া উমার রামপদে প্রীতি জন্মাইলেন এবং উমাকে শিব-সতীর কথা তারপর বলিলেন। আর বলিলেন জয়-বিজয়ের উপাখ্যান, তাহারা কিরূপে কুম্ভকর্ণ ও রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে তাহাদের মুক্তি

হইয়াছিল।

তাহার পর বলিলেন, নারদ একবার হরিকে শাপ দিয়াছিলেন। উমা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বড় জ্ঞানীর পক্ষে ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল। তাহার উত্তরে শিব বলিলেন, জগতে মূঢ় বা জ্ঞানী বলিয়া কিছুই নাই; রাম যাহাকে যেভাবে সাজান, তিনি তেমনি সাজেন।

তাহার পর বলিলেন নারদ ও ইন্দ্রের উপাখ্যান, এবং বলিলেন নারদের শ্রীহরির দ্বারা অহঙ্কার চূর্ণের কথা। নারদ সেইজন্য অভিশাপ দিলেন যে, বানরের রূপ দিয়া তুমি আমায় প্রতারণা করিয়াছ, দেহ ধরিয়া তোমাকে জন্ম লইতে হইবে। আবার সেই বানরই তোমার সহায় হইবে। স্ত্রী বিরহে তোমাকে অশেষ দুঃখ পাইতে হইবে। বিষ্ণু ধরণীর ভার হরণ করিবার জন্য 'রাম' হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এখানে রাজা প্রতাপভানুর উপাখ্যান অতি সংক্ষেপে বলিয়া তুলসীদাস—রামায়ণ আরম্ভ করিব।

রাজা প্রতাপভানুর উপাখ্যানে তুলসীদাস বলিয়াছেন, বলবান্ শত্রু যদি একজনও থাকে তাহাকে লঘু বিবেচনা করিবে না; আরও বলিয়াছেন যে, ভাগ্য অপ্রসন্ন হইলে ধূলাও মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় বলী হইয়া শত্রুতা করে, পিতা যমের সমান ও রজ্জু সর্পের সমান অনর্থকারী হয়।

পুণ্যাত্মা রাজা প্রতাপভানুর দেবতা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভাগ্যদোষে রাক্ষসে পরিণত হইয়াছিল। কালক্রমে সেই রাজা বন্ধু বান্ধবসহ রাক্ষস জন্মলাভ করিয়া রাবণ নামে প্রচণ্ড বীর হন। তাঁহার ভ্রাতা অরিমর্দ্দণ কুম্ভকর্ণ ও মন্ত্রী ধর্ম্মরুচি বিভীষণ নামে জন্ম লইয়াছিলেন। তিন ভাই শিব ও ব্রহ্মার তপস্যা করেন।

তুলসীদাসের রামায়ণে আছে,—কি করিয়া রাবণ লঙ্কার রাজা

হন, কি করিয়া কুবেরের পুষ্পক রথ কাড়িয়া লন। রাবণের অত্যাচারে পৃথিবী ধর্ম্মহীন হইল ; এবং ধরিত্রীদেবী বিশেষ আকুল হইয়া ধেনুরূপ ধারণ করিয়া মুনি ও দেবগণের নিকট গিয়া নিজের দুঃখের কথা জানাইলেন।

তুলসীদাস প্রয়াগে মাঘমেলার অন্তে, শিব ভবানীকে যে সকল কথা রাম সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলেন। তাহারই উপাখ্যান 'মানস চরিতে' লিখিয়াছেন।

স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার স্ত্রী শতরূপার উপাখ্যান, শ্রীরামের দর্শন ও কি করিয়া রাম ইঁহাদের পুত্ররূপে আসিবেন তাহা তুলসীদাস 'মানস-চরিতে' লিখিয়াছেন।

তুলসীদাস ১৬৩১ সংবৎ চৈত্র নবমী, মঙ্গলবার, যে তিথিতে রাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তিথিতে অযোধ্যাতে এই মানস-চরিত লিখিতে আরম্ভ করেন :—

ধরিত্রীদেবী উক্তরূপে নিজের দুঃখের কথা জানাইলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে হরিপাদপদ্মে শরণ লইতে বলিলেন। তখন দেবতারা ভাবিতে লাগিলেন, কোথা গমন করিলে শ্রীহরির সন্ধান পাওয়া যায়।

এই সকল উপাখ্যান শিব ভবানীকে বলিয়াছিলেন। শিব বলিয়াছিলেন যে,—তিনি উক্ত দেবতাদের দলে ছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের কথায় ভগবানের স্তব করেন। তখন আকাশবাণী শোনা গেল—'হে মুনি, সিদ্ধগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না। আমি নরবেশ ধরিয়া ধরাতে অবতীর্ণ হইব। কাশ্যপ ও অদিতি মহাতপে রত আছেন। তাঁহারা দশরথ ও কৌশল্যার রূপ ধারণ করিয়া জন্ম লইবেন। তাঁহাদের গৃহে আমি চারি অংশে

মায়াশক্তিসহ অবতার হইব। ধরিত্রীর দুঃখভার হরণ করিব।

ধরিত্রীদেবী আশ্বস্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে উপদেশ দিলেন যে, শ্রীহরি অবতাররূপে অবতীর্ণ হইলে, দেবতারা বানররূপ ধারণ করিয়া—পৃথিবীতে শ্রীহরির চরণ সেবা করিবে।

কালক্রমে দশরথ অযোধ্যার রাজা হইলেন ; দেবতারা বানর-রূপে জন্মিয়া—বনচররূপে রহিয়া সেনাদল গঠন করিলেন।

দশরথের তিন রাণী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। এইভাবে তুলসীদাস রামায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন।

তুলসীদাসের রামায়ণের ইতিবৃত্তাংশ মূল রামায়ণ হইতে লওয়া হইয়াছে, কিন্তু বহুলাংশে ইহা পৃথক গ্রন্থ। তত্ত্বাংশের বীজ প্রধানতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে লওয়া হইয়াছে। শ্রীরাম-তাপনীয় উপনিষৎ, রঘুবংশ, উত্তর-রামচরিত, কুমার-সম্ভব, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, প্রসন্ন রাঘব, হনুমন্নসটিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ইহা একটি পৃথক গ্রন্থ।

তুলসীদাস রামরচিত মানসে ভক্তির ধারা যে ভাবে বহাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বিহার হইতে উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, রাজস্থান, কাশ্মীর পর্য্যন্ত তুলসীদাসের রামায়ণের খুব আদর। তুলসীদাস রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। বাঙ্গালীরা কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ পড়িয়া থাকেন।

রামায়ণ মহাকাব্যে রাম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তিনি পুত্ররূপে, ভ্রাতারূপে, স্বামীরূপে, প্রভুরূপে, মিত্ররূপে, রাজারূপে অতুলনীয়। সকল সদ্গুণাবলীর আদর্শ বলিয়া পুরুষোত্তম মূর্তিতে যুগ-যুগান্তর ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন

বেদব্যাস বেদ সঙ্কলন করেন মহাভারতের যুগে, যদিও বেদ বহু প্রাচীন। বেদের পরই আমরা পাই বাল্মীকিকৃত রামায়ণ। বেদ-ব্যাস নানাবিধ অবোধ্য জিনিষ বোধগম্য করিবার জন্য এবং নানা অসামঞ্জস্য মিটাইবার অভিপ্রায়ে বেদান্ত দর্শন লিখিয়াছেন।

তিনি নানা যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে বেদে যাহা আছে তাহা যুক্তিসম্মত। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের যুক্তিতর্কও এত জটিল যে, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।

বেদান্ত দর্শন ইহাই প্রমান করিবার চেষ্টা করিয়াছে যে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব কখনও বলে আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার হাত, আমার শরীর। আমার বলে আমি যাইতেছি, আমি খাইতেছি, আমি বুদ্ধিমান ইত্যাদি। এই 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদির জ্ঞানের মূল তত্ত্ব কি? বেদব্যাস কৃত বেদান্ত দর্শনের অনেক ভাষ্য আছে। তাহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য বিখ্যাত। যখন বলি 'আমার দেহ' তখন সেই 'আমি' কে ও তাহার সহিত দেহের কি সম্বন্ধ— ইহা কি যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝান সম্ভব? যতক্ষণ না জানিতেছি 'আমি' কে, ততক্ষণ সেই 'আমির' সহিত দেহের সম্বন্ধ কি, তাহা কি করিয়া বুঝিব? প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলেই তাহা বুঝা যাইবে এই দেহ কি বা কাহার।

বেদান্ত দর্শন এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে :—

"অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" ॥

তত্রাথশব্দ আনন্তর্যগর্থঃ পরিগৃহ্যতে
নাধিকারার্থঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায়া অনধি কার্য্যত্বাৎ।

ইত্যাদি

অথ শব্দের অর্থ, 'অনন্তর'। পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে তারপর বুঝিতে হইবে। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদব্যাস বেদ বেদান্ত পাঠের পর পড়িবার জন্যই বেদান্ত দর্শন লিখিয়াছেন। বেদান্ত অধ্যায়ণের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এক নয়। ধর্ম্মজ্ঞানের ফল ঐহিক পরলৌকিক হিত যথা স্বর্গাদি লাভ। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মুক্তি।

'অতঃ' অর্থাৎ 'সেই হেতু'।

"অনন্তর সেই হেতু ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা।

ব্রহ্ম = বৃন্হ + মন্ + ক

বৃহ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব।

মন্ প্রত্যয় অর্থ নিরতিশয় অর্থাৎ অবধিরাহিত্য।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ যিনি নিরতিশয় মহান্, যাহা অপেক্ষা মহান্ আর কিছু নাই।

ধর্ম্মবিষয়ক বিধিবাক্যগুলি শ্রোতৃপুরুষকে "ইহা কর—এইরূপ কর" ইত্যাদি প্রকারে স্ব স্ব প্রতিপাদ্য যাগ দান প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াই বোধ জন্মায়, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বিধি-বাক্যগুলি উহার বিপরীত, 'কর" বলিয়া না করাইয়া—না বুঝাইয়া, কেবলমাত্র "জান—তাঁহাকে জান"—এতন্মাত্র উপদেশ দ্বারাই তদ্গত অজ্ঞান সংশয়াদি দোষের নিবৃত্তি করিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু জ্ঞানের জন্য কাহাকেও নিয়োজিত করে না; অনন্তর আপনা হইতেই ব্রহ্ম বিষয়ক অবরোধ উদিত হইয়া থাকে। অবরোধ বা ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগ দ্বারা জন্মে না—অর্থাৎ কর বলিয়া করান যায় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য দ্রব্যের সন্নিকর্ষ হইলেই যেমন আপনা হইতেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা অবরোধ হয়, সে স্থলে যেমন কর বলিতে হয় না,

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে।

নিত্য কি, অনিত্য কি, ঐহিক, আমুষ্মিক বিষয়—ভোগ বৈরাগ্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব। এই সকল বর্ত্তমান থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিতে অথবা জানিতে পারা যায়। জীব এই সকল গুণ-সম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে পারে, অন্যথা হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নহে।

ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য কর্মসমূহ সম্পূর্ণভাবে পুরুষ-প্রবৃত্তির অধীন, সেজন্য এই বিষয়ে বিধি নিষেধ ইত্যাদি সমস্তই সার্থক হয়। কিন্তু বস্তু স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, তাহা পুরুষ-প্রবৃত্তির অধীন নহে। বস্তু আমি ভুল দেখিতে পারি, কিন্তু বস্তু যেমন তেমনই থাকে। যে জ্ঞানে সংশয় জন্মে তাহা তত্ত্বজ্ঞান নয়। স্থানুতে স্থানু জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান যেমন বস্তুর অধীন, সিদ্ধবস্তু বিষয়ক প্রমাণের প্রামাণ্যও তেমনই সিদ্ধ বস্তুর অধীন। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মবস্তুর অধীন; প্রমাণের অধীন নহে। তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম, তাহা সিদ্ধ অর্থাৎ চিরনিত্য।

বলিতে পার, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তুই হন—নিষ্পাদ্যবস্তু না হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি অন্য প্রমাণের বিষয়। অন্য প্রমাণের বিষয় বলিলে, বেদান্তবাক্য বিচারের কোনও প্রয়োজন থাকে না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, না, ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু হইলেও প্রমাণা-ন্তরের বিষয় নহেন, অর্থাৎ বেদান্ত-বাক্য ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণই প্রসর প্রাপ্ত হয় না। তাহার হেতু এই যে, তিনি কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন।

এইরূপে তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে নানা যুক্তি দিয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর করা হইয়াছে বেদান্ত দর্শনে।

যাঁহাদের যথেষ্ট সময় আছে তাঁহারাই বেদান্ত দর্শন পাঠ করিতে পারেন, উহা সাধারণের পাঠ্য নহে, সেজন্য বেদান্ত দর্শনের কথা এইখানেই শেষ করিতেছি। প্রয়োজনবোধে, স্থানবিশেষে ইহার উল্লেখ করিব। বেদান্ত দর্শণ পাঠের জন্য তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত মহাভারত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বৃহত্তম গ্রন্থ। আজ অবধি যত গ্রন্থ রচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

"আর্য সমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) একত্র করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্য সমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্ক বিতর্ক ও চরিত্র নীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বাভাবিক ইতিহাস।" —রবীন্দ্রনাথ

* * *

"ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোক শিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।" —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাঙ্গলা ভাষায় মহাভারত আমরা সর্ব্বপ্রথম পাই কাশীরাম দাসের গ্রন্থে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "হিন্দু শাস্ত্রের" দ্বিতীয় খণ্ডে মহাভারত দিয়াছেন। ইহা দামোদর বিদ্যানন্দের লেখা। অতি

সুন্দর ও সংক্ষেপে সুললিত ও সরল ভাষায় এই মহাভারত বিদ্যানন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন।

শ্রীরাজশেখর বসুর মহাভারতের বঙ্গানুবাদ পড়িলেও মহাভারতের অনেক কিছুই জানা যায়। তবে গীতা অংশের জন্য শ্রীজগদীশ ঘোষের গীতাই আমার খুব পছন্দ হয়।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে মহাভারত দিতেছি :— পুরাকালে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াভিলাষে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে গিয়াছিলেন। তখন মহর্ষি সেখানে ছিলেন না। সেখানে মহর্ষির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত গন্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। তারপর শকুন্তলাকে সেইখানেই রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

শকুন্তলার গর্ভে রাজার এক পুত্র হয়, নাম ভরত। রাজা ভরতের প্রপৌত্র রাজা হস্তি হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেন।

ভরতের নাম হইতেই এই মহাদেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। (কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ঋষভের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম 'ভরত', তাঁহার নামেই এই মহাদেশের নাম হয় ভারতবর্ষ।)

তাঁহার প্রপৌত্র সংবরণের পুত্র কুরু কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরুর পাঁচ পুরুষ পরে রাজা প্রতীতের আবির্ভাব। তাঁহার পুত্র শান্তনু। তিনি গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র দেবব্রত। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি পিতার সিংহাসন লইবেন না এবং কখনও বিবাহ করিবেন না। সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল 'ভীষ্ম'। ভীষ্মের বিমাতা সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সেই মারা যান। বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, সেইজন্য পাণ্ডুই রাজা হইয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ও এক কন্যা দুঃশলা জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী। কন্যাকালে সূর্য্যের ঔরসে তাঁহার এক পুত্র হয়, নাম কর্ণ। পাণ্ডুর সহিত বিবাহের পর তাঁহার তিন পুত্র হয়, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। পাণ্ডুর পুত্রেরা 'পাণ্ডব' ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা 'কৌরব' নামে অভিহিত হইত। কৌরবেরা পাণ্ডবদের ঈর্ষা করিতেন। শরদ্বান্ ঋষির পুত্র কৃপকে শান্তনু পালন করিয়াছিলেন। কৃপের ভগিনী কৃপী। দ্রোণাচার্য্য কৌরব পাণ্ডবদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কৃপীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা। কর্ণ যে কুন্তীর কন্যাকালের পুত্র ইহা কেহ জানিতেন না। তাহাকে সূতপুত্র বলিয়াই সকলেই জানিত। যদিও তিনি অর্জ্জুনের সমকক্ষ বীর ছিলেন, তথাপি সূতপুত্র বলিয়া অর্জ্জুন তাঁহার সহিত সংগ্রাম পরীক্ষায় বিরত ছিলেন। এই কারণেই দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য কর্ণ সব সময়ই দুর্যোধনের সখ্যতাশৃঙ্খলে সংবদ্ধ ছিলেন।

পাণ্ডবদের জন্মের কিছুকাল পরেই পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠির সর্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডবদের হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে কৌরবরা এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে পাণ্ডবদের থাকিবার জন্য বিহারে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বিদুর পাণ্ডবদের এ বিষয়ে জানাইয়া দিয়াছিলেন। তথা হইতে পলাইয়া পাণ্ডবরা এক বনে আশ্রয় লয়। জতুগৃহ পুড়িয়া গেলে কৌরবরা মনে করিয়াছিল, পাণ্ডবরাও পুড়িয়া গিয়াছে। সেই বনে হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস থাকিত। ভীম হিড়িম্বকে বধ করে এবং তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করে। তাহাদের

ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র হয়। অরণ্য হইতে পাণ্ডবেরা ভিক্ষুর বেশে মাতা কুন্তীর সহিত দ্রুপদ নগরে আসিয়া বাস করেন। দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ হয়। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিসী ছিলেন। এই সময় পাণ্ডবদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের বিশেষভাবে পরিচয় হয় এবং এই সূত্রে তাঁহাদের যে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয়, তাঁহাদের জীবিতকালের মধ্যে তাহা কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

পাণ্ডবগণ জীবিত আছে জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগকে হস্তিনাপুরে আনাইয়া খাণ্ডবপ্রস্থ অর্থাৎ অর্দ্ধরাজ্য তাহাদিগকে দিলেন।

অর্জ্জুন মণিপুরে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র বভ্রুবাহন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্র অভিমন্যু। দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ পুত্র হইয়াছিল।

অগ্নিদেবের সন্তুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জ্জুন খাণ্ডব দগ্ধ করিয়াছিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নিদেব শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ও অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুক, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন।

ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব সভাগৃহ তৈয়ারী করিয়া দেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃত সমারোহের সহিত রাজসূয় যজ্ঞ সমাপিত করিলেন। দুর্যোধন তাহাতে অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া স্বীয় মাতুল শকুনির পরামর্শে, যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করিলেন। এই দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির বার বার হারিয়া সর্ব্বস্ব হারাইলেন, রাজ্যধন, ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী সবই হারাইলেন।

অনন্তর দ্রৌপদীর প্রার্থনায় এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুকম্পায় সেবারের মত দাসত্ব বিনির্মুক্ত হইলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কথায় পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইতে যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। এইবার পরাজিত হইয়া ১২ বৎসর বনবাসে গেলেন। সঙ্গে গেলেন চার ভাই ও দ্রৌপদী।

প্রথমে তাঁহারা কাম্যবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে গমন করিয়া তাঁহারা দ্বৈতবনে আশ্রম স্থাপন করিলেন। দ্বৈতবনে থাকিয়া যুধিষ্ঠির ঋষিবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে উত্তর অভিমুখে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে অর্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রের দেখা হইল। হিমালয়ের উপদেশে অর্জ্জুন কিরাতরূপী শিবের সহিত যুদ্ধ করিয়া, যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্যাস্ত্র দান করিলেন। বরুণ দিলেন পাশাস্ত্র, কুবের দিলেন দিব্য অস্ত্র। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া নিজ সিংহাসনে বসাইলেন।

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের বিরহে শোকার্ত্ত হইয়া নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে অন্যান্য ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত কৈলাশে পৌঁছিলেন। চার বৎসর পার হইলে তাঁহারা গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে ফিরিলে তাঁহারা কাম্যবনে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং কয়েকদিন তাঁহাদের সহিত অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজধানী দ্বারকাতে ফিরিয়া যান।

এই বনে থাকিবার কালে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য দুর্যোধন, কৌরবগণ ও পত্নিগণ সমভিব্যাহারে কাম্যবনে আসেন, কিন্তু গন্ধর্ব্বদের হাতে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন। তখন যুধিষ্ঠির তাহাদের রক্ষা করেন। এইখানে বাসকালেই জয়দ্রথ (দুর্যোধনের ভগ্নীপতি), দ্রৌপদীকে

লইয়া পলায়ন করার চেষ্টা করেন ; কিন্তু ভীমের নিকট পরাজিত হন। ভগ্নীপতির প্রাণনাশ করা উচিত নয় বলিয়া যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণবধে বাধা দেন।

এইভাবে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে, তাঁহারা বিরাট নগরে মৎস্যরাজ ভবনে এক বৎসর কাল প্রচ্ছন্নভাবে কাটাইলেন। এই সময়েই ভীম বিরাট রাজার সেনাপতি কীচককে বধ করেন। কীচক দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছিল। বিরাটরাজার নিকট যুধিষ্ঠির 'কঙ্ক' নাম লইয়া ব্রাহ্মণের কাজ করিতেন। ভীম 'বল্লভ' নামে সূপকারের কাজ করিতেন, অর্জ্জুন 'বৃহন্নলা' নামে রাজপুত্রী উত্তরার নৃত্যগীত শিক্ষকরূপে ; নকুল 'গ্রন্থিক' নামে অশ্বরক্ষক ও সহদেব 'তন্ত্রীপাল' নামে গোচারকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দ্রৌপদী 'সৌরিন্ধ্রী' নাম লইয়া পরিচারিকার কাজ করিতেন।

এই সময়ে দুর্যোধন বিরাট রাজার ছয় সহস্র গোধন অপহরণ করেন। অর্জ্জুন বিরাট রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া সেই গোধন উদ্ধার করেন এবং দুর্যোধনের মুকুট ছিন্ন করেন। ইতিমধ্যে ১৩ বৎসর বনবাস পার হইয়া যায়। বিরাট রাজকন্যা উত্তরার সহিত অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়। এই বিবাহে শ্রীকৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর স্থির হইল যে, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্ধরাজ্য প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু দুর্যোধন এ প্রস্তাবে কোনমতেই রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'সুতীক্ষ্ণ সূচাগ্রে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেকও পাণ্ডবদের দিব না। ধৃতরাষ্ট্র মোহবশে কাহারও সৎ উপদেশ গ্রাহ্য করিলেন না।

তখন দুই পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দুর্যোধনের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী ও পাণ্ডবদের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল।

কুরুক্ষেত্রে ১৮ দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের ইচ্ছায় তাঁহার 'নারায়ণ সেনা' দিলেন দুর্যোধনকে, এবং নিজে পাণ্ডবদের পক্ষে রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ভারতের সকল রাজাই কোনও না কোনও পক্ষে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দুই পক্ষই কুরুক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যগণে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অর্জ্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে তাঁহার রথ লইয়া গেলেন। কুরুপক্ষের সৈন্যের দিকে তাকাইয়া অর্জ্জুন দেখিলেন, সকলেই তাঁহার স্বজন। তিনি বলিলেন, "স্বজন বধ করিয়া আমি রাজ্য চাই না।" এই বলিয়া তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানা বিষয়ে নানাভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইলেন, বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইলেন। ধর্ম্মের তত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে রাজী হইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহাই 'গীতা' নামে প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পাণ্ডবরা জয়ী হইলেন। কৌরবকুল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল। তাঁহাদের পক্ষে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন সকলেই নিহত হইলেন, বাঁচিয়া রহিলেন কেবল কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা। পাণ্ডবদের পঞ্চ পাণ্ডব ছাড়া সকলেই নিহত হইলেন।

ভীষ্ম যুদ্ধ সমাপ্তির পরও শরশয্যায় ৬ মাস কাল জীবিত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তিনি যে সময় শরশয্যায় পড়িয়াছিলেন,

তখন যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট গিয়া নানারূপ প্রশ্ন করেন। ভীষ্ম সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। এই উপদেশগুলি শান্তি পর্বে ও অনুশাসন পর্বে আছে। এইগুলি সকলেরই জানা উচিত। শ্রীরাজশেখর বসুর লেখা মহাভারতে এইগুলি বেশ সংক্ষেপে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে।

যুদ্ধে জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ নিজধাম দ্বারকাতে ফিরিয়া যান। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের ২৬ বৎসর পর শ্রীকৃষ্ণ বংশীয় লোকেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পরস্পরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এক ব্যাধের দ্বারা শরবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের যাদবকুল ধ্বংস হইলে, যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, অন্যান্য ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থানের পথে বাহির হন। এই মহাপ্রস্থানের পথে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা যদিও অধুনা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তথাপি নানারূপ ভাব ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

বেদব্যাস কখন মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, কারণ যুধিষ্ঠিরের মৃত্যুর পরও তিনি জীবিত ছিলেন। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, তাঁর পুত্র পরীক্ষিত এবং তাহার পুত্র রাজা জন্মেজয়। জন্মেজয় ও ব্রাহ্মণদিগের বহু অনুরোধে ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত শুনাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। উপাখ্যান সমেত মহাভারতে ১ লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যান বাদ ব্যাসদেবের রচিত আর একটি মহাভারত আছে ২৪ হাজার শ্লোকের।

বৈশম্পায়ন এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারতটাই জন্মেজয়ের যজ্ঞে পাঠ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে সৌতি (উগ্রশ্রবা, জাতিতে সূত) উপস্থিত ছিলেন। তিনি যজ্ঞ হইতে ফিরিবার পথে নৈমিষারণ্যে

মহর্ষি শৌনক ও অন্যান্য মুনিদের নিকট সেই মহাভারত বর্ণনা করেন। ইহাতে মোট ১৮টি পর্ব। মহাভারতের বিষয় সাধারণভাবে জানিতে হইলে শ্রীরাজশেখর বসুর মহাভারত পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। বিশেষভাবে জানিতে হইলে কাশীরাম দাস বা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়া দরকার।

পুরাণ

"পুরাণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। যেকালে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানাদির নিয়মাবলী বেদের ব্রাহ্মণ অংশে প্রকটিত হয়, যেকালে পরমাত্মা ও পরলোকতত্ত্ব বেদের উপনিষদ্ অংশে নিরূপিত হয়, কুরু পাঞ্চালগণ, বিদেহ কাশীগণ যেকালে গঙ্গা ও যমুনার তীরে নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া যুদ্ধে, শৌর্য্যে, যাগ-যজ্ঞে ধর্ম্মপরায়ণতা, এবং শাস্ত্রানুশীলনে মনীষিতা প্রকাশ করেন, সেই অতি প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক কথা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস পুরাণ নামক গ্রন্থ রচিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ ঋষি আপনার নিজের পরিচয় দিবার সময় কহিয়াছেন, আমি ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এই তিন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, চতুর্থতঃ অথর্ব্বন অধ্যয়ন করিয়াছি, পঞ্চমতঃ ইতিহাস পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি"।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

এই অতি পুরাতন ইতিহাস পুরাণ সমূহ যে কি প্রকারের গ্রন্থ ছিল তাহা আমরা ঠিক নিরূপণ করিতে পারি না। সেকালের বোধ হয় সমস্তই অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত ছিল না, কারণ সেকালের অধিকাংশ গ্রন্থই গদ্য। কিন্তু সেকালের অনেক ঐতিহাসিক কথা যে পুরাণে রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালক্রমে প্রাচীন যুগের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, নূতন নূতন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। এখন

আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে বায়ু পুরাণ, ভগবত পুরাণ, মৎস্য পুরাণ প্রভৃতি অনেক পুরাণেই মগধ রাজ্যের বিস্তীর্ণ ইতিহাস সন্নিবেশিত আছে এবং চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক রাজার কথাও আছে। এমন কি খৃষ্টাব্দের পর যে অন্ধ্র রাজগণ মগধ ও দাক্ষিণাত্যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কথা পুরাণ সমূহে পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈদিক যুগে হিন্দুগণ ঐশী শক্তির নানারূপ বিকাশকে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, মরুৎ প্রভৃতি নানারূপ নাম দিয়া উপাসনা করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হিন্দুগণ ঈশ্বরের সৃষ্টি, পোষণ ও বিনাশকারিনী শক্তিকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনটি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন।

এই পুরাণগুলি তিন ভাগে বিভক্ত :— ব্রহ্মপুরাণ (মোট সংখ্যা ছিল ছয়)

১। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ২। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪। ভবিষ্য পুরাণ
৫। বামন পুরাণ ও ৬। ব্রহ্ম পুরাণ

বিষ্ণুপুরাণ (মোট সংখ্যা ছিল ৬)

১। বিষ্ণু পুরাণ, ২। নারদীয় পুরাণ, ৩। গরুড় পুরাণ
৪। ভাগবৎ পুরাণ, ৫। পদ্মপুরাণ ও ৬। বরাহ পুরাণ

শিবের পুরাণ (মোট সংখ্যা ৬)

১। মৎস্য পুরাণ, ২। কূর্ম্ম পুরাণ, ৩। লিঙ্গ পুরাণ
৪। বায়ু পুরাণ, ৫। স্কন্দ পুরাণ ও ৬। অগ্নি পুরাণ

এই আঠারটি পুরাণে মোট শ্লোক সংখ্যা ৪০০,০০০ চার লক্ষ।

—*—

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ :— (মোট শ্লোকসংখ্যা ১২০০০)

ইহাতে কল্পের মন্বন্তর বলা হইয়াছে আমাদের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ একদিন ও একরাত। দিনে সৃষ্টি ও রাত্রে লয়। এই সৃষ্টি-লয়কে কল্প বলে। মন্বন্তর শব্দের অর্থ এক মনুর রাজ্যের শাসনকাল। মনু ব্রহ্মার দেহ হইতে উদ্ভূত। সেই-জন্য ইঁহার নাম স্বয়ম্ভুব মনু। ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসরে এক একটি মন্বন্তর। একটি কল্পে ১৪টি মন্বন্তর। প্রতিটি মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন মনু, দেবতা, সপ্তর্ষি, ইন্দ্র ইত্যাদি।

মনুপুত্র কন্যা হইতে জাতির বিস্তার তাই তাহারা 'মানব'। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ। এইরূপ সহস্র-চারিযুগে ব্রহ্মার একদিন। চতুর্দ্দশ মনুর নাম :— স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত বা সত্যব্রত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি (ঋতুধামা) এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (বিষ্বক্‌সেন)।

ব্রহ্মার দিনাবসানে এইরূপ জলময়ী প্রলয়রূপিণী রজনী উপস্থিত হইলে, বায়ুনিকর প্রশান্ত হইয়া যায়, এবং পৃথিবী তলে যাবতীয় অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় সমস্ত জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন এই জগৎ যাহা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয় তাঁহার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা স্থাবর জঙ্গম বিরহিত একার্ণবে লোক সকলের বিভাগ কামনায় সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, সহস্রশীর্ষ, স্বর্ণবর্ণ এবং অতীন্দ্রিয় নারায়ণ মূর্ত্তিতে সেই একার্ণব মধ্যে নিদ্রিত হইয়া থাকেন। এই নারায়ণ 'পুরুষ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি রজোগুণে সৃষ্টি করেন, তমোগুণে নাশ করেন এবং সত্ত্বগুণে একার্ণবে নিদ্রিত থাকেন। অতীত কল্পে দক্ষ প্রভৃতি সাতটি মহর্ষি ছিলেন ; তাঁহারা মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া

এই কালরূপী নারায়ণকে প্রসুপ্ত দেখিয়াছিলেন। এই নিখিল জগৎ তাঁহারই।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে চারি আশ্রম, যথা, গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারী-ধর্ম্ম, বাণপ্রস্থীদিগের ধর্ম্ম ও ভিক্ষুরের ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে।

—●—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

ইহার চারি খণ্ড :—

১। ব্রহ্মখণ্ড=পরব্রহ্ম ও সৃষ্টি করার সবিস্তার বর্ণনা আছে।

২। প্রকৃতিখণ্ড=কাল ও অংশের ভেদ ও স্বরূপ, শুভ অশুভ রোগ ইত্যাদির বিষয় বর্ণিত আছে।

৩। গণেশখণ্ড :—গণেশের জন্ম ইত্যাদি বর্ণিত আছে।

৪। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা। এই পুরাণেই সর্ব্বপ্রথম শ্রীরাধার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই।

রাধা শ্রীকৃষ্ণের অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা গোপালরাজ নন্দ দুগ্ধপোষ্য বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া গোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। গোপবধূ রাধাও সেই সময়ে গাভী রাখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় আকাশে নিবিড় ঘনঘটা উদিত হইয়া প্রচণ্ড বাত্যার পূর্ব্ব লক্ষণ সূচিত করিল। উহা দেখিয়া গোপরাজ নন্দ কৃষ্ণকে রাধার ক্রোড়ে দিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন। রাধা কৃষ্ণকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কিশোর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার বালকমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই

ছবিটুকু অবলম্বন করিয়াই 'গীত গোবিন্দের' প্রথম শ্লোকটি রচিত হইয়াছে।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ"

ইত্যাদি।

চন্দ্রের উপাখ্যান—ইহা কবির কল্পনা মাত্র। নক্ষত্রকে চন্দ্রের পত্নী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই সাতাশটি নক্ষত্রের নাম :—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশীর্ষা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী। ইহাতে জানিবার মত আছে যে, 'শিষ্ট ব্যক্তি দুর্দ্ধর্ষকে ভয় করিয়া চলে। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ কাহাকেও ভয় করে না।"

ইহাতে আরও কয়েকটি উপাখ্যান আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ (মোট ৯০০০ শ্লোক ১৩৮ অধ্যায়)

ইহার অন্তর্গত শ্রীশ্রীদেবী মাহাত্ম্যের তুল্য মধুর হৃদয়হারী ও সরলভাবপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ অতি বিরল।

দেবী মাহাত্ম্য মেধস মুনি রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে লিপিবদ্ধ আছে।

মার্কণ্ডেয় মুনি এই কথোপকথন ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি তাহা নিজ ভাগুরীকে শুনাইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হুবহু দ্রোণপুত্র সর্ব্বজ্ঞ "পক্ষিগণ" মহর্ষি জৈমিনিকে বলিয়াছিলেন এবং তাহাই শ্রীশ্রীচণ্ডীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাস শিষ্য সূত কর্ত্তৃক নৈমিষারণ্যে ঋষি সমাজে ইহা কথিত হয়। শ্রীশ্রীদেবী মাহাত্ম্য পৃথকভাবে দেওয়া হইবে পরে।

—●—

ভবিষ্য পুরাণ

শ্লোক সংখ্যা ১৪৫০০

অধুনালুপ্ত মাত্র ৭০০০ হাজার পাওয়া যায়। ইহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। মহাভারতের যুদ্ধের পর, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় উহা কথিত হয়।

ইহাতে কল্কি অবতারের বিষয় প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কল্কিপুরাণও বলে। সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে ইহার একটি হস্তলিখিত পুস্তক আছে বলিয়া শুনা যায়।

ইহাতে চন্দ্রহাসের উপাখ্যান আছে এবং আছে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, চতুর্বর্ণের সংস্কার, আশ্রমধর্ম্ম ইত্যাদি কথা।

বামন পুরাণ

এই পুরাণ নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট ও মহর্ষি পুলস্ত্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। মোট ৫৫ অধ্যায় ও ১০,০০০ শ্লোক।

১ম অধ্যায়—হরপার্ব্বতীর কথোপকথন।
২য় " —দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ।
৩য় " —নরকপাল মোচন।
৪র্থ " —দক্ষযজ্ঞের ধ্বংস।
৫ম " —মহাদেব কর্ত্তৃক সূর্য্যের নিগ্রহ।
৬ষ্ঠ " —সতী লইয়া মহাদেবের ভ্রমণ ও মদনদাহ।
৭ম " —উর্ব্বশীর উৎপত্তি ইত্যাদি।
৮ম " —নারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ।

১১শ হইতে ১৫শ
অধ্যায় অবধি—সুকেশী নামক রাক্ষসের বিবৃতি।
১৬শ অবধি কতকগুলি শৈবব্রত।

[illegible] হইতে ২০শ অধ্যায়— কাত্যায়নীর মাহাত্ম্য ও মহিষাসুরাদির বধ।

[illegible] অধ্যায়—শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

[illegible] অধ্যায় হইতে বলির প্রাদুর্ভাব ও বামন অবতারের কথা।

তাহাড়া উল্লেখযোগ্য উপাখ্যান, ব্রহ্মা-সনৎকুমার সংবাদ।

[illegible]টি পৃথক পৃথক নরক আছে। তাহাদিগকে 'পুন্নাম' নরক বলে। মানুষ মাত্রই এই সকল নরক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পুত্রের সকলকে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবান নারায়ণের প্রীতি উৎপাদন করে। পুত্র এই ঘোর পুন্নাম নরক সকলের ধ্বংস করে এই নিমিত্ত উহার নাম 'পুত্র'।

"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মা প্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥

লোকের যশঃ অপহরণ, অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণ হইয়া ঘৃতাদি বিক্রয় করা, চণ্ডালাদির দান গ্রহণ, এই সকল মহাপাপ। নিজের দোষ আচ্ছাদন, পরের দোষ প্রকাশ, কটু বাক্য প্রয়োগ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, এই সকল পাপ কার্য্য ও ঘোর নরকের কারণ।

এই সকল পাপ সংযুক্ত মনুষ্য যদি শঙ্করের প্রীতিসাধন করে তাহা হইলে জ্ঞানের আধিক্য হয় এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে উক্ত অশেষ পাপ সকলও নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যায়।

ব্রহ্মপুরাণ

ইহাকে আদিপুরাণ বলে। ইহা ব্রহ্মা দক্ষের নিকট প্রকাশ করেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা—১০,০০০। আজকাল পাওয়া যায় মাত্র ৭।৮ হাজার।

ভবিষ্য পুরাণ

শ্লোক সংখ্যা ১৪৫০০

অধুনালুপ্ত মাত্র ৭০০০ হাজার পাওয়া যায়। ইহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। মহাভারতের যুদ্ধের পর, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় উহা কথিত হয়।

ইহাতে কল্কি অবতারের বিষয় প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কল্কিপুরাণও বলে। সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে ইহার একটি হস্তলিখিত পুস্তক আছে বলিয়া শুনা যায়।

ইহাতে চন্দ্রহাসের উপাখ্যান আছে এবং আছে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, চতুর্বর্ণের সংস্কার, আশ্রমধর্ম্ম ইত্যাদি কথা।

বামন পুরাণ

এই পুরাণ নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট ও মহর্ষি পুলস্ত্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। মোট ৫৫ অধ্যায় ও ১০,০০০ শ্লোক।

১ম অধ্যায়—হরপার্ব্বতীর কথোপকথন।
২য় " — দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গ।
৩য় " —নরকপাল মোচন।
৪র্থ " —দক্ষযজ্ঞের ধ্বংস।
৫ম " —মহাদেব কর্ত্তৃক সূর্য্যের নিগ্রহ।
৬ষ্ঠ " —সতী লইয়া মহাদেবের ভ্রমণ ও মদনদাহ।
৭ম " —উর্ব্বশীর উৎপত্তি ইত্যাদি।
৮ম " —নারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ।

১১শ হইতে ১৫শ অধ্যায় অবধি—সুকেশী নামক রাক্ষসের বিবৃতি।
১৬শ অবধি কতকগুলি শৈবব্রত।

১৭শ হইতে ২০শ অধ্যায়— কাত্যায়নীর মাহাত্ম্য ও মহিষাসুরাদির বধ।

২১শ অধ্যায়—শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

[illegible] অধ্যায় হইতে বলির প্রাদুর্ভাব ও বামন অবতারের কথা।

তাছাড়া উল্লেখযোগ্য উপাখ্যান, ব্রহ্মা-সনৎকুমার সংবাদ।

১৬টি পৃথক পৃথক নরক আছে। তাহাদিগকে 'পুন্নাম' নরক বলে। মানুষ মাত্রই এই সকল নরক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পুত্রের সম্পর্কে উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবান নারায়ণের প্রীতি উৎপাদন করে। পুত্র এই ঘোর পুন্নাম নরক সকলের ধ্বংস করে এই নিমিত্ত উহার নাম 'পুত্র'।

"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মা প্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥

লোকের যশঃ অপহরণ, অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণ হইয়া ঘৃতাদি বিক্রয় করা, চণ্ডালাদির দান গ্রহণ, এই সকল মহাপাপ। নিজের দোষ আচ্ছাদন, পরের দোষ প্রকাশ, কটু বাক্য প্রয়োগ, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, এই সকল পাপ কার্য্য ও ঘোর নরকের কারণ।

এই সকল পাপ সংযুক্ত মনুষ্য যদি শঙ্করের প্রীতিসাধন করে তাহা হইলে জ্ঞানের আধিক্য হয় এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে উক্ত অশেষ পাপ সকলও নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যায়।

ব্রহ্মপুরাণ

ইহাকে আদিপুরাণ বলে। ইহা ব্রহ্মা দক্ষের নিকট প্রকাশ করেন। ইহার শ্লোক সংখ্যা—১০,০০০। আজকাল পাওয়া যায় মাত্র ৭।৮ হাজার।

ইহার বক্তা মুনি লোমহর্ষণ ও শ্রোতা নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ। ইহাতে ব্রহ্মার মহিমার কথা আছে। বহুস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে "জগন্নাথ" বলিয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বর্ণনা আছে। ইহার অধিকভাগে সূর্য্যের পূজাদি বর্ণিত হইয়াছে ও যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আছে।

বিষ্ণুপুরাণ

ইহা বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রথম পুরাণ। ইহা অতি প্রাচীন। ইহার পদ্য ভাগ যেমন প্রাঞ্জল, গদ্যভাগ সেইরূপ প্রসাদগুণ সম্পন্ন।

ইহাতে স্বর্গ, প্রলয়, পৃথিবী বিস্তার, দ্বীপবর্ষ ও দেশাদি বিভাগ, সমুদ্র, পর্ব্বত ও নদ-নদীর সংস্থান, সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান ও প্রমাণ, দেব ও রাজর্ষিদিগের বংশ বর্ণনা, মনু ও মন্বন্তর কথন, কল্প, বিকল্প, যুগ-বিভাগ, যুগধর্ম্ম, কল্পান্তস্বরূপ, দেব, ঋষি ও রাজাদিগের চরিত, বেদ ও তাহার শাখা বিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয় পৌরাণিক বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

ভাগবতের দশম খণ্ডের ন্যায় ইহার পঞ্চম অংশটি কেবল শ্রীকৃষ্ণ চরিত বর্ণনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে প্রহ্লাদ-চরিত বর্ণিত হইয়াছে আর আছে, কিরূপে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ভরত মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নারদীয় পুরাণ

শ্লোক সংখ্যা—২৫০০

বৃহন্নারদীয় পুরাণ ইহারই অন্তর্গত বা অংশ। সগর রাজ্যের জন্মকথা ইহাতে দেওয়া আছে। তদ্বংশীয় রাজা ভগীরথ এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে গঙ্গা মাহাত্ম্য

বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে যে সকল উপদেশ দেওয়া আছে তাহার কিছু নিয়ে দিলাম :—

'যেখানে প্রবল অহঙ্কার বিদ্যমান, সেখানে নিশ্চয়ই কাম প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। তাহাতেই মানুষের বিনাশ হয়। অসূয়াবিষ্টচিত্ত-দিগের সম্পদ তুষ, অগ্নি ও বায়ু এই ত্রয়ের সংযোগের ন্যায় ক্ষণ-কালেই অদৃশ্য হয়।'

'অসূয়াবিষ্টচিত্ত এবং নিষ্ঠুরভাষীদিগের প্রিয়মিত্র, পুত্র বা বন্ধুবর্গ সকলেই শত্রুরূপে পরিণত হয়। তাহারা ইহ ও পরলোকে কখনই সুখ পায় না।'

ভগবান নারায়ণ যাহার প্রতি অনুকূল থাকেন, তাহার সৌভাগ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, আর তিনি যাহার উপর বিমুখ তাহার সৌভাগ্য দিন দিন বিনষ্ট হইতে থাকে।'

ইহকালে অপযশ কাহাকে না নিহত করে? অকীর্ত্তিতুল্য মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নাই; ক্রোধতুল্য রিপু নাই, নিন্দাতুল্য পাতক নাই; মোহতুল্য ভয় নাই এবং অসূয়ার সমান আর অকীর্ত্তি নাই।

'কামের সমান অগ্নিও আর নাই, বিষয়-তৃষ্ণার সমান পাপও নাই এবং বিষয়াসক্তির সমান বিষও আর নাই।'

'পণ্ডিতগণ ব্রহ্মহত্যাদির পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায় বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দাম্ভিক, নিন্দুক এবং ভ্রূণঘাতীর নিষ্কৃতির উপায় বলেন নাই।'

নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ধর্ম্মঅবজ্ঞাকারী, বিশ্বাসঘাতক ইহাদের নিষ্কৃতি নাই।'

'মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অচিন্তিত দুঃখ আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ অতর্কিত সুখও উপস্থিত হয়; সুতরাং এ বিষয়ে দৈবেরই প্রাধান্য। সব সময় বিবেককে স্থির রাখিও।

এমন কোনও শুভ নাই, যাহা মনুষ্য সৎ-সঙ্গতি হইতে লাভ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত

ইহার শ্লোক সংখ্যা—১৮,০০০

ইহা একটি উপাদেয় গ্রন্থ। "ধর্ম্মের পবিত্রতা, জ্ঞানের বিকাশ, যোগের গাম্ভীর্য্য, প্রেমের উচ্ছ্বাস, নীতির দূরদর্শিতা এবং ভক্তির প্রবাহ, এই সকল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি স্কন্ধে, প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি উপন্যাসে জ্বলন্তরূপে বিরাজ করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে, স্মৃতির সদাচারে, দর্শনের তত্ত্ব বিচারে, পুরাণের পুরাবৃত্তে, নীতির লোকতত্ত্বে যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই"

সকলেরই ইহা পড়া উচিত। এ বিষয়ে আবার লিখিব।

গরুড় পুরাণ

এই পুরাণ পৌরাণিক বিষয় অপেক্ষা পূজা পদ্ধতি কর্ম্মবিপাক ইত্যাদিই বেশী পাওয়া যায়। ইহাতে আছে দীক্ষা বিধি, যোগোপদেশ, বিষ্ণুর সহস্রনাম, গায়ত্রী মাহাত্ম্য, দুর্গাপূজা, গৃহস্থধর্ম্ম নীতিসার, রামায়ণাদির কথন, ধর্ম্মশাস্ত্র ও আত্মজ্ঞান।

নিয়ে নীতিসার কিছু দিলাম :—

নীতিসার

গুণবানকে কার্যে নিযুক্ত করিবে, গুণহীনকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ পণ্ডিতের সকলই গুণ ও মুর্খের সবই দোষ।

সর্ব্বদা সাধু চরিত ব্যক্তির সহিত উপবেশন করিবে এবং সঙ্গতি করিলে; বিবাদ বা মৈত্রী সাধু চরিত ব্যক্তির সহিত করিও।

বিনীত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী পণ্ডিতের সহিত একত্র থাকিলে যদি বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তথাপি তাহাদের সহিত বাস করিবে; রাজ্যভোগ হইলেও খলদিগের সহিত বাস করিও না।

কার্য্য নিঃশেষ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়, এজন্য সমুদয় কার্য্য নিঃশেষে সম্পাদন করিবে।

ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিতে পারিলেই তপঃ সঞ্চয় হয়। সর্ব্বদা অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি, লোভশূন্য গৃহীর গৃহই তপোবনস্বরূপ।

সত্যের দ্বারা ধর্ম্ম, যোগের দ্বারা বিদ্যা, মার্জন দ্বারা তৈজস পাত্র এবং শীলের দ্বারা কুল রক্ষিত হয়।

কোনও অবস্থাতেই স্বকীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে ও ধনবানের নিকট ভিক্ষা করা বিধেয় নহে, তাহাতে মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়ঃ।

সম্পদ সকল ভাগ্যক্ষয় হইলেই ক্ষীণ হয়, উপভোগে উহাদের ক্ষয় হয় না। কারণ মানুষের পূর্ব্বজন্ম অর্জ্জিত পুণ্য ও পাপ উভয়ই বিদ্যমান থাকে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের হাত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। সুশীলতাই মনুষ্য মাত্রের ভূষণ।

যাহার ত্রিকূট পর্ব্বত দুর্গ, সমুদ্র পরিখা, সৈন্য রাক্ষসগণ, বৃত্তি [illegible], এবং শুক্রাচার্য্য প্রণীত সমুদয় শাস্ত্রনীতি, সেই রাবণও কালের বশে বিনষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে অধীত বিদ্যা, পূর্ব্বকালে প্রদত্ত ধন এবং প্রথম অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল মনুষ্যের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয়। যাবতীয় ঘটনার প্রতি কর্ম্মই প্রধান কারণ। শুভনক্ষত্রে শুভগ্রহে এবং বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত লগ্নে বিবাহ হইলেও জানকী কেবল দুঃখ ভোগই করিয়াছেন।

পুত্র পিতৃকর্ম্ম দ্বারা অথবা পিতা পুত্রকর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না, সকলেই স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হইয়া গমন করে।

শুচিতা পাঁচ প্রকার :— সত্য, মনের নির্ম্মলতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সকল প্রাণীর উপর দয়া, সলিল দ্বারা শরীরের মল অপনয়ন।

সম্মানে হৃষ্ট হয় না, অবমানে ক্রোধ করে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে না, এই সকল সাধুর লক্ষণ।

যেখানে সন্তোষ সেইখানেই সুখ। স্নেহই দুঃখের মূল ও আধার। স্নেহ পরিত্যাগ করিও। যাহা পরাধীন তাহাই দুঃখের হেতু। যাহা নিজের আয়ত্ত তাহাই সুখের কারণ। সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুখ পরিত্যাগ করে, যাহাতে দুঃখ না আসে।

অতীত ভাবিও না, ভবিষ্যত্ ভাবিও না, কেবল বর্ত্তমানের অনুগমন কর— শোক দ্বারা পীড়িত হইবে না।

আপনার ছিদ্র কখনও পরের নিকট প্রকাশ করিও না, কিন্তু সর্বতোভাবে পরের ছিদ্র জানিতে চেষ্টা করিবে।

কূর্ম্মের ন্যায় নিজের অঙ্গ সকল আবরণ করিয়া রাখিবে, অথচ অভিনিবেশ সহকারে পরের চেষ্টার প্রতি লক্ষ রাখিবে।

অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, মিত্রকেও বিশ্বাস করিবে না, কারণ মিত্র যদি কখনও বিরক্ত হয়, তাহা হইলে সমুদয় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে পারে।

অজীর্ণে ভোজন, বিষের সমান। দরিদ্র ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের সভা বিষের স্বরূপ।

কোনও প্রকার পুষ্প, বিশেষতঃ শ্বেত পুষ্প মস্তকে ধারণ করিলে অলক্ষ্মী দূরীভূত হয়।

অতিশয় জলপান, কঠিন দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, বেগের নিরোধ, দিবা নিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই ছয়টি মানুষের নানাবিধ রোগের কারণ।

নারায়ণের সদৃশ লক্ষ্মীর প্রিয় ব্যক্তিও যদি মলিন বস্ত্র পরিধান করে, দন্তের মল পরিষ্কার না করে, অধিক ভোজন করে, সকলের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে, এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়ে শয্যা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করে।

কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্ত্রী, রাজা, অগ্নি, সর্প, কণ্ঠস্থ বিদ্যা, শত্রুর আদর, ভোগ ও আস্বাদে বিশ্বাস করে না।

শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্তভাবে অবস্থান করিবে না।

শত নির্গুণ পুত্র অপেক্ষা গুণবান্ একটি পুত্রই ভাল।

শত্রু অতি তুচ্ছ হইলেও যদি অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে অবজ্ঞা করিও না।

যৌবন সময়ে যাহার চিত্ত শান্তিকে আশ্রয় করে, সেই প্রকৃত শান্ত।

পরান্ন ভোজন, পরধনে জীবিকা নির্ব্বাহ, পরশয্যায় শয়ন, পরস্ত্রীর সংসর্গ, পরগৃহে বাস এই সকল ইন্দ্রেরও সম্পদ নষ্ট করে।

সম্ভাষণ, শরীর স্পর্শ, নিশ্বাস সম্পর্ক, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন এবং এক যানে আরোহণ, এই সকল কার্য্যের দ্বারাই মনুষ্যে পাপের সংক্রমণ হয়।

রূপ স্ত্রীর, ক্রোধ তপস্যার, দূর ভ্রমণ গাভীর ও শূদ্রান্ন ভোজন ব্রাহ্মণের নাশের কারণ হয়।

মহৎদিগের সম্মানই ধন। মানই অর্থের মূল, মান লাভ হইলে ধনের আবশ্যকতা নাই। যাহার মান ও দর্প নষ্ট হইয়াছে, তাহার ধন ও আয়ুতে কোনও প্রয়োজন নাই।

সৎকুলে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের ধনহীন হইয়াও কখনও নীচের কার্য্য করা উচিত নয়।

দাতার দারিদ্র, ধনবানের কার্পণ্য, পুত্রের অবশ্যতা, প্রভুর দৌর্জ্জন্য এবং পরের উপকারে মৃত্যু, এই পাঁচটি দুঃসহ দুঃখকর।

স্ত্রী বিয়োগ, স্বজনের অপমান, ঋণের শেষ, কুজনের সেবা এবং নিজের দারিদ্র্যহেতু মিত্রগণের বৈমুখ্য এই পাঁচটি অগ্নিতুল্য অতি তীব্রভাবে মনুষ্যের হৃদয়কে দগ্ধ করে।

মনুষ্যের সহস্র সহস্র চিন্তা থাকিলেও বক্ষমান চারটি বিষয়ে চিন্তা অসিধারের তুল্য মর্ম্মভেদী :

(১) নীচ কর্ত্তৃক অপমান বিষয়ে (২) ক্ষুধিত কলত্রের ক্ষুৎ প্রতিকারে অসমর্থ বিষয়ে (৩) ভার্য্যার বিরক্তি বিষয়ে এবং (৪) জ্ঞাতিগণের উৎপীড়ন বিষয়ে।

যাহার নাম পরাক্রমে, তপস্যায়, দানে, বিদ্যায় অথবা অর্থোপার্জ্জনে প্রসিদ্ধ না হয় সে জননীর পুরীষতুল্য।

যে পরের অধীনে কাজ করে তাহার জীবিত হইয়াও মৃত্যুর তুল্য।

লোকের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রত্যুপকার করিবে, এবং হিংসাকারীর প্রতি প্রতিহিংসা করিবে, কারণ দুষ্ট ব্যক্তির সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিলে কোনও দোষ হয় না।

দুর্জ্জনের সংসর্গে সজ্জনও বিনষ্ট হয়।

সমুদয় পদার্থেরই ক্ষয় হইবে। উন্নতি হইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটিয়া থাকে, এবং জন্ম হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

যে মিত্র অসমক্ষে অনিষ্ট চেষ্টা করে, এবং প্রত্যক্ষে মিষ্ট কথা বলে, এরূপ কপটচারী মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে।

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং
বর্জয়েত্তাদৃশং বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥"

বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিশ্রান্ত অশ্ব, উন্মত্ত হস্তী, প্রথম প্রসূতা গাভী, এবং উদক শূন্যস্থানে স্থিত মণ্ডুকদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করে।

মেঘের ছায়া, তৃণের অগ্নি, নীচ সেবা, পথিস্থিত সলিল, বেশ্যার অনুরাগ এবং খলজনের প্রীতি, এই ছয়টি জল বুদ্বুদ সদৃশ ক্ষণিক মাত্র।

মনুষ্য লোভ, অনবধানতা এবং বিশ্বাস এই তিন দ্বারা বিনষ্ট হয়; অতএব লোভ, প্রসাদ ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে।

যে পর্য্যন্ত ভয়ের কারণ উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহা হইতে ভয় করিবে। ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, সাহসীর ন্যায় কার্য্য করিবে।

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিবে না।

নিজস্থানে স্থিতিকালে যাহারা মিত্র হয়, এ স্থান হইতে চ্যুত হইলে তাহারাই আবার শত্রু হয়। ধনবান ব্যক্তিতে ধনদান বৃথা। নীচ ব্যক্তির সহিত সদ্ব্যবহারও নিষ্ফল।

—*—

পদ্মপুরাণ

শ্লোকসংখ্যা ৫৫০০০—৬য় খণ্ড

ইহাতে বিষ্ণু মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট, তারপর নারদ মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট ইহা প্রকাশ করেন। ব্যাস তদীয় শিষ্য সূতকে এই পুরাণ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

বোম্বের বিশ্বনাথ মণ্ডলিক এই পুরাণের খণ্ডগুলি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রহ ৪৮৪৫২টি শ্লোক।

১ম খণ্ড :—নদ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির নাম ও বর্ণনা, তীর্থ-ফলশ্রুতি ইত্যাদি।

২য় খণ্ড :— বৃত্রাসুর উপাখ্যান, পৃথুচরিত, বেন উপখ্যান ইত্যাদি।

৩য় খণ্ড :—নানাবিধ ব্রতের নাম ও অনুষ্ঠান।

৪র্থ খণ্ড :— নানাবিধ উপাখ্যান, শ্রীকৃষ্ণচরিত, শ্রীরামচরিত ইত্যাদি।

৫ম খণ্ড :— সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদি।

৬ষ্ট খণ্ড :—বদরিকাশ্রম বর্ণনা ও কতকগুলি মাহাত্ম্য ও উপাখ্যান।

ইহাতে উল্লেখযোগ্য চাণক্যশ্লোক, শান্তিশতক ও নীতিসার শ্লোকও আছে।

বরাহপুরাণ

শ্লোকসংখ্যা :—১০০০ হইতে ১০৫০০, কেহ কেহ বলেন ২৪০০০

ইহাতে পূজা ব্রতাদির ব্যবস্থা, স্তবাদিতে পরিপূর্ণ। মহিষাসুরে সহিত ভগবতী কাত্যায়নীর যুদ্ধের বর্ণনা ইহাতে আছে। মার্কণ্ডে

উপাখ্যান, সগর রাজার উপাখ্যান, কলিরাজার উপাখ্যান, গালব ও [illegible] উপাখ্যান, ভগীরথ উপাখ্যান ইহার অন্তর্গত।

মৎস্যপুরাণ

শ্লোকসংখ্যা ১৪,০০০

ইহাতে আছে মনু ও মৎস্যের বৃত্তান্ত, দেব ও অসুরদিগের উৎপত্তি, রাজনীতি এবং মন্দির ও প্রতিমা নির্ম্মাণের কথা। রাজনীতি অতি পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে। তাহা পড়িলে বুঝা যায় যে, পুরাকালে ভারতের রাজন্যবর্গ রাজনীতিতে কত অগ্রসর হইয়াছিলেন। চন্দ্রের জন্ম, বৃহস্পতি ভার্য্যা তারার অপহরণ, তারার গর্ভে ও চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্মের কথা এই পুরাণে আছে।

কূর্ম্মপুরাণ

শ্লোকসংখ্যা ১৭০০০, কিন্তু এই পুরাণেই লেখা আছে যে ইহার শ্লোকসংখ্যা মাত্র ৬০০০। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বাকীগুলি পরে যুক্ত হইয়াছে। এই পুরাণের বক্তা ভগবান্ বিষ্ণু।

ইহা শৈব সম্প্রদায়ের অনুগত পুরাণ, তবে ইহাতে কৃষ্ণ মাহাত্ম্যও আছে। ইহাতে যে দক্ষ-যজ্ঞের কথা বর্ণিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন; প্রহ্লাদ চরিত্রও ভাগবত হইতে অন্যরূপ। কলিকাল কিরূপ তাহার বর্ণনাও আছে। কূর্ম্ম-পুরাণের শ্রেষ্ঠ অংশ "তত্ত্বজ্ঞান"। অতি সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বেদান্তের সব কিছু ইহাতে দেওয়া আছে। ইহাকে বেদান্ত দর্শনের সারস্বরূপ বলা চলে। এই পুরাণে আছে—রাবণ সীতাকে হরণ করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে, সাধ্বী সীতা আপনার প্রকৃত স্বরূপ অগ্নির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া সীতার মায়া-নির্ম্মিত একটি প্রতিরূপ সেই স্থানে রাখিলেন।

রাবণ সেই মায়া সীতাকেই হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই পুরাণ পাঠ করিলে হিন্দু ধর্ম্মের অনেক কিছু জানা যায়।

লিঙ্গপুরাণ

শ্লোকসংখ্যা ১১০০০। দুইভাগে বিভক্ত—প্রথমটিতে ১০৮ অধ্যায় ও দ্বিতীয়টিতে ৫৫টি অধ্যায়।

এই পুরাণে শিবের প্রভাব ও মাহাত্ম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিব লিঙ্গের উদ্ভব ও আরাধনা ও নানা বিষয় বর্ণিত আছে। যযাতির উপাখ্যানও ইহাতে আছে। তাহাতে এই সকল উপদেশ দেওয়া আছে :—"উপভোগে কখনই বিষয়াভিলাষে শান্তি লাভ করে না, প্রত্যুত ঘৃত দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়; এই পৃথিবীতে যত প্রকার শস্য আছে, এবং যে পরিমাণ সুবর্ণ আছে, যত পশু ও স্ত্রী আছে, সে সমস্ত একজনের তৃপ্তিপ্রদ হয় না। অর্থাৎ যদি এক ব্যক্তি ঐ সমস্ত লাভ করে তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি হয় না, এই বিবেচনা করিয়া শান্তি লাভ করিবে। যখন মনুষ্য কোনও প্রাণীর প্রতি শারীরিক চেষ্টা, মন ও বাক্য দ্বারা পাপাচরণ না করে, তখনই সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

দেহীদিগের স্বভাবতঃই সমুদয় বিনষ্ট হয়; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থাতেও ধনাশা ও জীবিতাশা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।"

বায়ুপুরাণ

শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০

ইহা একটি মহাপুরাণ। ইহাতে প্রথমে সৃষ্টির বিষয়, পরে কল্প এবং বিশেষ করিয়া শ্বেতকল্পের বিষয় বর্ণিত আছে। চতুর্থ ভাগে আছে যোগশাস্ত্র, যোগী ও শিবের মাহাত্ম্য। বায়ুপুরাণ ও শিব পুরাণ এই উভয়েরই বক্তা বায়ু এবং উভয়েই শিবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত

হইয়াছে। শিবপুরের সৌন্দর্য্য হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

—*—

স্কন্দপুরাণ

শ্লোকসংখ্যা ৮১,১০০।

ইহার বহু খণ্ড, বহু সংহিতা এবং মাহাত্ম্যে বিভক্ত আছে। 'ইণ্ডিয়া হাউসে'-এ ইহার দুইখানি সংহিতা, ১৪ খণ্ড ও ১২খানি মাহাত্ম্য পুস্তক আছে।

ইহার ভিতর কাশীখণ্ড, উৎকল খণ্ড, রেবা খণ্ড ও হিমবৎ খণ্ড প্রসিদ্ধ। সংহিতার ভিতর সূত সংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, সৌর সংহিতা ও কল্প সংহিতা প্রসিদ্ধ।

মাহাত্ম্য গ্রন্থের ভিতর, প্রয়াগ, মাঘ, কার্ত্তিক, গঙ্গা, গয়া মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ।

ইহাতেই লোপমুদ্রার পতিপরায়ণতার বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি ছিলেন অগস্ত্য মুনির স্ত্রী। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অত্রিপত্নী অনসূয়া, শাণ্ডিল্য পত্নী লক্ষ্মী, মনুজায়া শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা সকলেই লোপমুদ্রার পতিব্রতার গুণ বর্ণনা করেন।

এই পুরাণে গৃহস্থ ধর্ম্মের কথা সবিস্তারে দেওয়া আছে।

—•—

অগ্নি পুরাণ

শ্লোকসংখ্যা—১৫০০০ অধ্যায় (বর্ত্তমান) ৩৮২

ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। ইহার দ্বাদশ অধ্যায়ে হরি বংশ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও মাহাত্ম্য আছে। পূজা ও তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতিই এই পুরাণে পাওয়া যায়।

—●—

উপপুরাণও ১৮টি আছে :—যথা, সনৎকুমার, নরসিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাশা, কপিল, মানব, ঔষনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভাগবত ও বশিষ্ঠ।

—*—

কথিত আছে পুরাণগুলি সবই ব্যাসদেবের রচিত। পরে ইহাতে অনেক কিছু নূতন যোগ করা হইয়াছে। সূত নামক এক প্রকার সঙ্কর জাতীয় মানুষই পুরাণ পাঠ করিতেন। তাঁহাদের দ্বারাই পুরাণগুলি মাঝে মাঝে অদল বদল হইয়াছে। নূতন ইতিহাস, নূতন পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদি যোগ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুরাণের কথা এইখানেই থাক। সাধারণের যাহা জানা দরকার তাহা দিলাম। যিনি ইহার বেশী চান, তিনি বাঙালীর অষ্টাদশ পুরাণ পাওয়া যায়, তাহা পড়িবেন। পুরাণগুলি পৃথক পৃথকভাবেও পাওয়া যায়। বেশীর ভাগই অধুনা অচল এবং আজকালের সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না। 'সূত' জাতিও নাই এবং আমাদের সমাজ পুরাণের প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না। কাজেই এ বিষয়ে আর বেশী লিখিয়া কোনও লাভ হইবে না।

অবতার

দেবতারা কখন কখন মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। পূর্ণব্রহ্ম বা তাঁহার অংশে জীবদেহে পূর্ণাবতার বা অংশাবতার রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন অধর্মের নাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। পুরাণে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা আছে। যথা :—মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও শতপথ ব্রাহ্মণে অবতারতত্ত্বের বিবরণ দেওয়া আছে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।" শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন, "আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মায়াবলে আবির্ভূত হই।" শ্রীধর স্বামী ভক্তিপন্থী, তিনি অর্থ করিয়াছেন, "আমার নিজ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তি দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।" মহাভারতে 'অবতারের' উল্লেখ আছে। তাহাতে বুদ্ধ অবতার নহেন, যদিও পুরাণে বুদ্ধ অবতার। সেখানে 'হংস' অবতার। ভাগবতে আছে, "এতে চাংশ কলা! পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।" অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, পরব্রহ্ম; সমস্ত অবতার তাঁহারই অংশ ও কলা। অবতার-বাদ বেদান্তের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

—*—

কর্ম্মফল

গীতায় বলা হইয়াছে, মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। কর্ম্মের শেষ হইলে আর দেহ ধারণ হয় না। অতএব স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে যে মানুষ যখন প্রথম জন্ম লইয়াছিল তখন তাহার পূর্ব্ব জন্ম ছিল না। কাজেই কর্ম্মও ছিল না। তাহা হইলে মনুষ্য দেহ পাইল কি করিয়া? প্রথম জন্মের পূর্ব্বে কোনও কর্ম্মই ছিল না তাহার সংস্কার বা স্বভাব থাকিতে পারে না।

মরিলেই জন্মিতে হইবে জন্মান্তরবাদ। আত্মার মৃত্যু নাই। অন্যান্য ধর্ম্মেরও আত্মা (Soal) অবিনাশী। মৃত্যু হয় দেহের। দেহ সূক্ষ্ম ও স্থূল। স্থূল শরীরের মৃত্যু হইলেও যতদিন আত্মা সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে থাকে ততদিন সূক্ষ্ম শরীরের মৃত্যু হয় না। স্থূল দেহের মৃত্যুর পর আত্মা সূক্ষ্মদেহে বিদ্যমান থাকিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসারে পুনরায় দেহ ধারণ করে।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, এই পঞ্চস্থূলভূত দ্বারা নির্ম্মিত এই স্থূল দেহ।

মহত্তত্ব, বুদ্ধিতত্ব, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) এই আঠারটি দ্বারা গঠিত সূক্ষ্মদেহ।

সূক্ষ্মদেহ লইয়া জীব মৃত্যুর পর উৎক্রমণ করে। নূতন স্থূলদেহে পাপ পুণ্যাদির ফলভোগ করে।

কিন্তু প্রথম মনুষ্য জন্মে যখন পূর্ব্ব 'কর্ম্ম' নাই, সেইজন্য পাপ পুণ্যের ফলের কোনও প্রশ্নই নাই।

জীব ক্রমবিকাশেই মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে। শাস্ত্রমতে ৮৪ লক্ষ প্রকার যোনি পার হইয়া জীবের মনুষ্য জন্ম প্রাপ্তি হয়। জীব এই ৮৪ লক্ষ জন্ম পশুত্বে আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ পশুজীবনকে ঘেরিয়া রাখে। কিন্তু বিবেকের অভাবের জন্য তাহাদের কর্ম্ম, কর্ম্ম নয়। পশুর কর্ম্মের জন্য পশু জীবাত্মার কোনও বন্ধন হয় না। সেইজন্য ক্রমবিকাশের প্রথায় উন্নত হইতে উন্নততর দেহপ্রাপ্ত হইতে থাকে, যতদিন না সেই জীবাত্মা মনুষ্য দেহপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য জন্মে পাপ পুণ্য ফলভোগের কোনও প্রশ্নই আসে না। সেটাও একটা পশুজীবনের মতই।

কিন্তু ৮৪ লক্ষ জন্ম পশুজন্মের ফলে কাম, ক্রোধ ও লোভ জনিত যে স্বভাব বা প্রকৃতির সৃষ্টি হয়, তাহা সংস্কাররূপে মনুষ্যদেহে সূক্ষ্ম দেহের সহিত আবদ্ধ থাকে। এইভাবেই পশুত্বের সংস্কার মনুষ্যে প্রবেশ করে। কাজেই প্রথম মনুষ্য জন্মে জীব পশুর সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং তাহার সহিত পায় মন, বুদ্ধি ও বিবেকের ছিটে-ফোঁটা।

পশুজীবনে তমোগুণের আধিক্যবশতঃ অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি, বিবেক সম্পূর্ণরূপে তমোগুণাচ্ছন্ন থাকে।

যতদিন পশুজন্ম ততদিন 'কর্ম্ম' নাই। জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহ লইয়া নিম্ন হইতে উচ্চতর দেহ ধারণ করিতে থাকে এবং ক্রমে দেহের গঠন ও মনুষ্যদেহের মত হইতে থাকে। সকল পশুর জীবাত্মা একদিন না একদিন মনুষ্য দেহপ্রাপ্ত হইবেই। ইহাই ক্রমবিকাশ।

মনুষ্য জন্মের প্রথম অবস্থায় থাকে পশুর প্রকৃতি, এবং ক্রমে ক্রমে বিবেক বিচার উন্নত হইতে থাকে। কাজেই প্রথম প্রথম মনুষ্য জন্মে জীব পশুজন্মের প্রকৃতিজাত কর্ম্মই করে।

মনুষ্যদেহ পাইয়া জীব যদি বিবেক বিচারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশুপ্রকৃতি না কমায়, তাহা হইলে নানাপ্রকার পাপ কর্ম্ম করিয়া, নানাপ্রকার অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল ভোগের জন্য এক দেহ হইতে অন্য দেহ ধারণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

মনুষ্য বলিতে জীবাত্মা, দেহ তাহার আবরণ মাত্র। সুখ-দুঃখ ভোগ করে মোহবশতঃ জীবাত্মা। মনুষ্যদেহের অনেক বিশেষত্ব আছে। মনুষ্য তাহার বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে অভ্যাস দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বিবেক বিচার দ্বারা সৎ ও অসৎ বাছিয়া লইতে পারে। ভগবৎ ভক্তির দ্বারা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা, নেতি নেতি বিচার দ্বারা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। তবে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি নাই। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। ভগবৎ ভক্তির দ্বারা, যোগ ও সাধনার দ্বারা কর্ম্মফল ভোগ করিবার সহ্য শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে।

অসৎজন সংসর্গে মনুষ্য পশু হইতেও অধম হইতে পারে, আবার সৎজন সংসর্গে দেবত্ব ব্রহ্মত্বও পাইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত

ইহার বর্ণিত বিষয় তিন শ্রেণীর :— তত্ত্ব, স্তব ও আখ্যান। আখ্যান অর্থে কথা ও কাহিনী ; কথা, যথা— ঘটনার বিবৃতি, কাহিনী, যথা--ভক্তচরিত্র কথন। শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে প্রথম ভাগবত বলেন। ব্রহ্মা স্বীয় মানস পুত্র নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেব নিজপুত্র শুকদেবকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োবেশন সভায় এই ভাগবত কথা বিবৃত করেন। রোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা (সূত) ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া উহা শ্রবণ করেন। সূত নৈমিষারণ্যে শৌণিক ঋষির যজ্ঞ ক্ষেত্রে উহা তাঁহাদিগের নিকট কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদের বিভাগ করিয়াছেন, বেদান্ত সূত্র লিখিয়াছেন, মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি চিত্ত অ-শান্ত। শ্রীনারদ আসিয়া বলিলেন, তোমার ব্রহ্মসূত্র যুক্তিবাদী, মহাভারত কাম্য কর্ম্মবাদী, শ্রীহরির লীলা ও গুণ কথন ব্যতীত আর সকল কথাই 'বাতাহত নৌকব', বুদ্ধিকে সতত চঞ্চল করে। তখন বেদব্যাস লিখিলেন এই মহাগ্রন্থ নারদের উপদেশে। নারদ ব্যাসদেবকে নিজের জন্ম কর্ম্ম কথা বলিলেন আর উপদেশ দিলেন শ্রীহরির লীলা কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিতে। ব্যাসদেব সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে শম্যাপ্রাস নামে তাঁহার আশ্রমে বসিয়া ভাগবত রচনা করিলেন।

সূত নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌণক ঋষিকেও অন্যান্য ঋষিগণকে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহাই "শ্রীমৎভাগবত" নামে প্রসিদ্ধ।

সূত পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও দেহত্যাগের ব্যাপার সব বর্ণনা করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। তাঁহার স্ত্রী উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর পরীক্ষিতের জন্ম হয়।

সূত পরীক্ষিতের মৃগয়ার কথা বলিলেন ও কিভাবে ঋষিপুত্র তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন ও সেইজন্য তক্ষক দংশনে কিভাবে পরীক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছিল তাহাও বলিলেন। ঋষিপুত্র এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন, এ 'কুলাঙ্গার রাজা অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে মহাসর্প তক্ষক দংশনে প্রাণত্যাগ করিবে'। রাজা পরীক্ষিত মৃত্যুর অপেক্ষায় পূর্ব্বমুখে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় শুকদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুমুক্ষু মুমূর্ষু ব্যক্তির এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? শুকদেব বলিলেন অন্তে নারায়ণ স্মৃতি, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন, বিষয়-প্রমত্ত জীবের একমাত্র গতি। শুকদেব পরীক্ষিতকে নানাবিধ ভক্তি বিষয়ক উপদেশ দিলেন ও নারদ ও ব্রহ্মার কথা বলিলেন। তখন পরীক্ষিত শুকদেবকে বলিলেন, নারদ যে হরিকথা ব্রহ্মার নিকট শুনিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনি শুনিতে ইচ্ছা করেন। শুকদেব তাহাই বর্ণনা করিলেন। 'সূত' নৈমিষারণ্যে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই নীচে লিখিতেছি :—

ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ দিলেন—

"অগ্রে আমি একমাত্র ছিলাম। সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না— এক্ষণে এই বিশ্বরূপে আমি আছি। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি" ইত্যাদি।

ব্রহ্মাও ঐ চারিটি শ্লোক নারদকে ব্যাখ্যা করিলেন।

মহাভারতের সমস্ত ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কথাও সূত বলিলেন।

সূত তাহার পর ক্রমে মৈত্রেয়—বিদুরের কথা বলিলেন : মৈত্রেয় বলিয়াছিলেন— 'শ্রীহরির সৃষ্টিমহিমা অবর্ণনীয়'।

তারপর সূত ক্রমে ক্রমে সনকাদি মুনি, মনু, শতরূপা, জয়-বিজয়, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষের জন্ম কথা বলিলেন। কিরূপে বরাহদেব হিরণ্যকশিপুকে সাগর মধ্যে বধ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। তারপর বলিলেন কর্দ্দম, দেবহূতি ও কপিলের কথা। কিরূপে কপিল নামে শ্রীভগবান দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন তাহাও বলিলেন। কপিল তাঁহার মাতাকে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাও বর্ণনা করিলেন। কপিল দেবহূতিকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে দিতেছি :

"শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীহরির প্রতি জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহাই অহৈতুকী ভক্তি এবং মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ আমার পদসেবাপরায়ণ হইয়া এবং আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আমার সহিত একাত্মও ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা আমার সুন্দর প্রসন্নমুখ ও অরুণলোচন দিব্য বরদরূপ দর্শন করেন এবং ইচ্ছামত বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।"

সাংখ্যতত্ত্ব সকলের পৃথক পৃথক লক্ষণ, যাহা জানিলে মানুষ প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্ত হয়, পুরুষ-প্রকৃতি জ্ঞান দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, অষ্টাঙ্গ যোগে কিরূপে নিরুপাধি স্বরূপের জ্ঞান হয়, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে তাহা আছে।

কালের প্রভাব ও সংসারের ঘোরত্ব, অধার্ম্মিকের তামসীগতি, নরযোনিপ্রাপ্তি, জীবের উর্দ্ধগতি ও পুনরাবৃত্তি— ক্রমে সূত এই সকল ব্যাখ্যা করিলেন।

তারপর সূত 'দক্ষ, শিব ও সতীর' কথা বলিলেন :

প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞে, দক্ষ শিবকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। নিজে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে শিবকে আমন্ত্রণ করেন নাই। দক্ষের কন্যা শিবের স্ত্রী সতী সেই যজ্ঞে যাইবার জন্য শিবের সম্মতি চাহিলেন। শিব সম্মতি দিলেন কিন্তু বলিলেন, কুটুম্বের দুর্বাক্য বড়ই ক্লেশকর।

সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া পতিনিন্দা শুনিয়া সেইখানেই দেহত্যাগ করিলেন। শিব সেই খবর শুনিয়া তাঁর জটা হইতে বীরভদ্র নামে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব করিলেন। বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিলেন ও দক্ষের মস্তক ছেদন করিলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া শিব দক্ষকে জীবন দান করিলেন। শ্রীভগবান্ হরি সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি এক ; ব্রহ্মা-শিব আমারই রূপ ; সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ একভাবাপন্ন স্বরূপত্রয়কে যিনি ভেদ দৃষ্টিতে না দেখেন, শান্তিলাভ করেন।"

সূত বলিতে লাগিলেন— তারপর শুকদেব পরীক্ষিতকে উত্তানপাদ, ধ্রুব, নারদ ও মনুর কথা বলিলেন। কিরূপে ধ্রুব ধ্রুবলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলিলেন। কিরূপে বেনের বাহু মন্থন করিয়া এক পুরুষ ও এক স্ত্রী উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বলিলেন। সেই পুরুষের নাম ছিল পৃথু।

যক্ষ গন্ধর্ব্বেরা পৃথুকে নানা ভূষণে ও অস্ত্রে সুসজ্জিত করিলেন। কিরূপে পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সকলে নিজ নিজ প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি গাভীরূপী পৃথিবী হইতে দোহন করিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। পৃথু প্রজাগণকে শ্রীহরির চরণ কমলে স্থিরমতি রাখিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে উপদেশ দিলেন।

সকলে পৃথুকে সাধুবাদ আশীর্ব্বাদ করিলেন, বলিলেন, "সমাঃ সঞ্জব শশ্বতী।"

সনৎকুমার আদি চারজন মুনি তাঁহার নিকট আসিয়া সদুপদেশ দিয়াছিলেন, "শ্রীহরির চরণে একনিষ্ঠ দুর্লভ মতি অন্তরের কামনারূপ মলকে বিধৌত করে। অতএব সেই চরমশরণ বাসুদেবের ভজনা কর।"

সূত তাহার পর, শুকদেব কথিত প্রাচীনবর্হি ও নারদের কথা বলিলেন,— নারদ প্রাচীনবর্হিকে রাজা পুরঞ্জনের উপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন,— "অহংমম বোধ কর্ম্মবন্ধন ও নানা জন্মের কারণ, জাগরণ যেমন দুঃস্বপ্নের প্রতিকারক অবিদ্যাপ্রসূত সংসারাসক্তি হইতে নিবৃত্তিই তেমন সকল দুঃখের প্রতিকারক। কামনা হইতে বিরত হও, সর্ব্বশক্তির আধার সেই শ্রীহরিই দেহীগণের আত্মা, তাঁহার পাদমূলেই মানুষের একমাত্র আশ্রয়, তাহাই লোকের একমাত্র কল্যাণকর।

লিঙ্গদেহ (সূক্ষ্মদেহ) ধ্বংস হয় না, তাহা দ্বারাই কর্ম্মফল ভোগ হয়। সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যেই পুরুষ পুনরায় স্থূল দেহ গ্রহণ করে, যাহা দ্বারা সুখ দুঃখাদির বোধ হয়।"

তারপর প্রচেতাগণও নারদের কথা বলিলেন; নারদ শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন করিয়া প্রচেতাগণকে শ্রীহরির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। এই অবধি চতুর্থ স্কন্ধ।

—●—

পঞ্চম স্কন্ধ

(আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সূত নৈমিষারণ্যে শৌণক ঋষির যজ্ঞ-ক্ষেত্রে শুকদেব কথিত হরিকথা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ।)

প্রিয়ব্রত, ব্রহ্মা, আগ্নীধ্র ও নাভির উপাখ্যান শুনাইলেন—

মনুপুত্র প্রিয়ব্রত; তাহার কন্যা উর্জ্জস্বতীর সহিত শুক্রাচার্যের বিবাহ হয়। তাহাদের কন্যা দেবযানী। (রবীন্দ্রনাথ এই কচ—দেবযানীর কবিতা লিখিয়াছেন।

আগ্নীধ্রর পুত্র নাভির সহিত মেরুদেবীর বিবাহ হয়। তাঁহাদের গর্ভে শ্রীহরি শুদ্ধ তনু ধারণ করিয়া 'ঋষভ' নামে অবতীর্ণ হন। ঋষভের একশত পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত; তাঁহার নামেই ভারতবর্ষ। তিনিও তাঁহার নয়জন ভ্রাতা ভগবৎ ধর্ম্ম প্রকাশক।

তাহার পর সূত শুকদেব কথিত ভরত—মৃগশাবক, রাহুগণ ও জড়ভরত উপাখ্যান শুনাইলেন:—

ভরতের মৃগজন্ম, তাহার জড়ভরত হইয়া জন্মগ্রহণ, সিন্ধুপতি রাহুগণের শিবিকা বহন ও রাজাকে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান, দান ইত্যাদি কথা বলিলেন। তারপর বলিলেন গয়রাজার কথা- তিনি বিষ্ণুপূজা করিতেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন, মায়ারূপে ভগবান্ হরির অবস্থিতি বিবরণ ও নরক সকলের বিবরণ দিলেন। এইখানে পঞ্চম স্কন্ধ শেষ হইল।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

তারপর সূত, শুকদেব কথিত অজামিল, যমদূত ও বিষ্ণুদূতের উপাখ্যান শুনাইলেন। অজামিল অত্যন্ত দূষিত চরিত্র ছিল। তাহার নারায়ণ নামে এক পুত্র ছিল। সে মৃত্যুকালে পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুদূত আসিয়া তাহাকে যমদূতের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কোটি জন্মার্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় যদি বিবশ অবস্থায়ও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করে।

দ্বিতীয় দক্ষ, প্রচেতাগণও নারদের কথা বলিলেন। কিজন্য দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন। এই অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, ইহ-পরলোকে তোমার কোথাও স্থান হইবে না। তুমি সর্ব্বদা কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে।

তারপর বলিলেন, বিশ্বরূপ ও বৃত্রজন্মের কথা। আর বর্ণনা করিলেন বৃত্রবধের কাহিনী। মুনি দধীচি মৃত্যুবরণ করিয়া নিজ অস্থি দান করিয়াছিলেন। সেই অস্থি হইতে অস্ত্র তৈয়ার করিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র-বৃত্রাসুর সংগ্রাম অতি চমৎকার কাহিনী। বৃত্রাসুর অত্যন্ত নারায়ণ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতীব বিচিত্র।

তারপর বলিলেন চিত্রকেতু, নারদ, মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথা। চিত্রকেতুর উপাখ্যানে আছে, "জীব কর্ম্মবশে বহুযোনি ভ্রমণ করে। জীবের পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী বলিয়া কিছুই নাই। জীব যতদিন দেহে থাকে ততদিন মাত্র দেহের উৎপাদনকারীর সঙ্গে তাহার দৈহিক সম্বন্ধ থাকে। সে ভোগের সাক্ষীমাত্র, ভোক্তা নয়।

উমার শাপে দানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিত্রকেতু ত্বষ্টার যজ্ঞে উৎপন্ন হইয়া বৃত্রাসুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—*—

সপ্তম স্কন্ধ

শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন, —শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতের সুহৃৎ। তিনি সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবগণকে বর্দ্ধিত করেন; রজ ও তমঃ-প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করেন। ইহাতে দেবপ্রীতি বা অসুর-দ্বেষ নাই; তিনি জীবের হিতার্থে তাহাকে দণ্ড দেন।

তারপর সূত, শুকদেব কথিত হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন।

বৈরিতা, ভয়, ভক্তি, স্নেহ ও কাম দ্বারা বা যে কোনও উপায়েই হউক শ্রীহরিতে যুক্ত থাকিতে হইবে।

নিরন্তর শ্রীহরির প্রতি শত্রুভাব পোষণ দ্বারা মানুষ যেমন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এমনকি ভক্তিযোগ দ্বারাও তেমন হয় না।

ভিত্তি ছিদ্রে ভ্রমর কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া তৈলপায়ী কীট ভয়বশতঃ একান্তমনে ভ্রমরকে স্মরণ করিতে করিতে সেই ভ্রমররূপ প্রাপ্ত হয়।

গোপীগণ প্রণয়, কংস ভয় ও শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ দ্বেষ, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ, যুধিষ্ঠির স্নেহ ও নারদ ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে নানা ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন। তাহাও শুকদেব পরীক্ষিতকে শুনাইয়াছিলেন। মোক্ষ লক্ষণও বর্ণনা করিয়াছিলেন।

—*—

অষ্টম স্কন্ধ

পরীক্ষিত অন্যান্য মুনিগণের কথা জানিতে চাহিলে, শুকদেব প্রথম চার মনুর কথা বলিয়া, গজেন্দ্র ও গ্রহের কথা বলিলেন। গজ-কুম্ভীরের সহস্র বর্ষ যুদ্ধ ও শ্রীহরি কর্ত্তৃক গজের উদ্ধার কিরূপে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন।

শুকদেব সমুদ্রমন্থন, ইন্দ্র ও বলির কাহিনী বলিলেন। তারপর বলিলেন অদিতি, কশ্যপ ও বামনের কথা। শ্রীহরির মোহিনীরূপ

দর্শনে মহেশের মোহ প্রাপ্তির কথাও বলিলেন। অদিতির গর্ভে ভগবান্ বামনদেবের জন্ম। বামনদেব বলির নিকট নিজের ত্রিপাদ ভূমি চাহিয়াছিলেন। বলি তাহাতে রাজী হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সব বুঝিতে পারিয়া রাজা বলিকে বাধা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন এই বামনরূপী স্বয়ং বিষ্ণু। তিনি তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন। শুক্রাচার্য্য এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন : "যে দানে দাতার জীবিকা বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেরূপ দানের প্রশংসা করেন না। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, পূজাদি বিত্তবান লোকেরাই করিতে পারেন। ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম ও স্বজন এই পাঁচ ভাগে বিত্তকে ভাগ করিলে ইহ-পর উভয়লোকে সুখ হইয়া থাকে।

স্ত্রী সমীপে পরিহাস বাক্যে, বিবাহ বিষয়ে, জীবিকার নিমিত্ত, প্রাণনাশ সঙ্কটকালে গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে, কাহারও প্রাণহিংসা নিবারণার্থ মিথ্যা কথা দোষের নহে।"

বলি শুক্রাচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, সত্যপালন করিয়াছিলেন। বামন একপদে বলির সমস্ত ভূমি, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ পরিপূর্ণ করিলেন। যখন তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান হইল না, তখন বলি বলিলেন,— "পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণিমে নিজং" অর্থাৎ এই মস্তকেই তৃতীয় পদ দাও।

শ্রীহরি বলির সত্যরক্ষার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে দেবদুর্লভ পদ প্রদান করিলেন। বলিলেন, সাবর্ণি মন্বন্তরে ইনি ইন্দ্র হইবেন এবং তাবৎকাল ইনি সুতলে বাস করিবেন।

তারপর শুকদেব মৎস্য অবতারের কথা বলিলেন।

—*—

নবম স্কন্ধ

বিবস্বান্, শ্রদ্ধদেব, ইক্ষ্বাকু ও নাভাগের কথা বলিলেন।

অম্বরীষ, দুর্ব্বাসা, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণুর কথাও বলিলেন।

নাভাগের পুত্র মহাভাগবত অম্বরীষ। অপরিমিত সম্পদের অধিকারী হইয়াও তিনি সাধারণের দুর্লভ সেই বিষয়কে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করিতেন। ভগবান্ বাসুদেব ও তাঁহার সাধু ভক্তগণের প্রতি তিনি পরম ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেন। তিনি মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠের গুণানুবর্ণনে, হস্তকে মন্দির মার্জ্জনায়, কর্ণকে হরি সম্বন্ধীয় সৎকথা শ্রবণে, চক্ষুকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শনে, স্পর্শকে ভগবদভক্তের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণকে তাঁহার পাদপদ্মলগ্ন তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণে, পদদ্বয়কে হরিক্ষেত্র বিচরণে, মস্তককে শ্রীকৃষ্ণের পদবন্দনায় ও সমস্ত কামনাকে তাঁহারই দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপ হরিভক্তকে দুর্ব্বাসা মুনি একবার শাপ দেওয়াতে, শ্রীহরি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া সুদর্শন চক্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীহরি নিজেও দুর্ব্বাসাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশেষে দুর্ব্বাসা অম্বরীষের চরণ স্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়।

তাহার পর শুকদেব মান্ধাতা ও ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান বলিলেন। ইহা সত্যযুগের কথা। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু; তাঁহার বংশে পুরঞ্জয় বা ককুৎস্থ এবং পুরঞ্জয়ের বংশে রাজা মান্ধাতার জন্ম। তাহার পুত্র সত্যব্রত বশিষ্ঠের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার বিশ্বামিত্রের প্রভাবে স্বর্গে উঠিতে থাকেন। কিন্তু অর্ধপথেই থাকিয়া যান। তিনি অদ্যাপি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত এবং আকাশে আছেন।

এই বংশে সগরের জন্ম হয়, তাঁর অশ্বমেধের অশ্ব ইন্দ্র হরণ করেন। সেই অশ্ব অনুসন্ধানের জন্য তাঁর পুত্রেরা পৃথিবী খনন করেন; তাহা হইতেই সাগরের উৎপত্তি। কপিলের শাপে তাঁর পুত্রেরা ভস্মীভূত হন। তৎবংশীয় ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া, কপিলে-স্তুতি দ্বারা ভস্মীভূত পূর্ব্ব-পুরুষগণকে উদ্ধার করেন। এই বংশের রাজা বালিক ও রাজা মহাভাগবত খটাঙ্গ। খটাঙ্গের বংশেই বিখ্যাত রাজা রঘু। রঘুর পুত্র অজ ও অজের পুত্র দশরথ এবং তৎপুত্র রাম।

শ্রীরামচন্দ্রের যমজ পুত্র লব ও কুশ। ঐ বংশের শেষ রাজা সুমিত্র।

অতঃপর শুকদেব সীতার জন্ম কথা বলিলেন। ইক্ষ্বাকুর অপর পুত্রের নাম নিমি। নিমি দেহ-বন্ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন—'মাভূন্মে দেহবন্ধনম্'। মুনিগণ নিমির দেহ মন্থন করিয়া এক কুমার উৎপন্ন করিলেন। ঐ ভাবে জাত বলিয়া ঐ কুমারের নাম বিদেহ জনক হইল। ঐ বংশে জন্মেন শীরধ্বজ জনক। তিনি একদা যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হলের অগ্রভাগে শ্রীরামপত্নী সীতাদেবী উৎপন্ন হন। এই বংশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই যোগেশ্বর প্রসাদে আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং গৃহস্থ হইয়াও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বিমুক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই সংসারী ব্রহ্মজ্ঞের কথা উঠিলেই রাজা জনকের উদাহরণ দেওয়া হয়।)

ইহার পর ক্রমে শুকদেব পরশুরামের কথা বলিলেন। ইনি ২১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। আরও বলিলেন যযাতি-দেবযানীর কাহিনী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, ভরতের কাহিনী ও রন্তিদেবের অতিথি সৎকারের কাহিনী।

ইহার পর শুকদেব যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। যদু বংশের উৎপত্তি কিভাবে পুরুরবার বংশ হইতে হইয়াছিল তাহা নিম্নে দিলাম :

- পুরুরবা
  - নহুষ
    - যযাতি (তাঁহার দুই পত্নী)
      - শর্মিষ্ঠা
        - দ্রুহ্যু
        - অনু
          - ইহার বংশে দীর্ঘতমা
            - অঙ্গ
            - বঙ্গ
            - কলিঙ্গ
            - সুহ্ম
            - পুণ্ড্র
            - ওড্র
        - পুরু
          - (পিতা জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যযাতি পুরুরবাকেই রাজ্য দিয়াছিলেন)
          - পুরুর বংশের অধস্তন দুষ্মন্ত (শকুন্তলাকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়াছিলেন)
            - ভরত
      - দেবযানী
        - যদু
        - তুর্বসু

(ইহার পালিত পুত্র ভরদ্বাজের বংশে জন্মেন মহাত্মা রন্তিদেব, যিনি অতিথি সৎকারের জন্য বিখ্যাত)

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার বংশাবলী হইতে দেখা যাইতেছে দেবযানীর গর্ভে যদু নামে এক পুত্র হয়। যদু বংশে মধু; তাহার শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃষ্ণি। সেইজন্য এই বংশের যাদবদের, যাদব, মাধব বা বৃষ্ণি বলে।

পুনর্ব্বসুর পুত্র অন্ধুক; অন্ধুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের কন্যা দেবকী। দেবকীকে বিবাহ করেন যদুবংশীয় শূরপুত্র বসুদেব। উগ্রসেনের পুত্র কংস। বসুদেবের অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেবের অপর স্ত্রী রোহিনীর গর্ভে জন্ম বলদেবের। কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত বিবাহ হয় অর্জ্জুনের।

—*—

দশম স্কন্ধ

শুকদেব পরীক্ষিতের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পৃথিবী দৈত্যরাজগণের অসংখ্য সেনাভার সহ্য করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল। ব্রহ্মা দেবগণসহ ক্ষীর সাগরের তীরে গিয়া, পুরুষ সুক্ত দ্বারা নারায়ণের স্তব করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক আকাশবাণী শুনিলেন যে, "শ্রীহরি সত্বরই যদু বংশে বসুদেব গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, তোমরা স্ব স্ব পত্নীসহ মর্ত্ত্যধামে গিয়া জন্মগ্রহণ কর"। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের এই উপলক্ষ্য।

মথুরায় কংসের কারা-গৃহে কৃষ্ণের জন্ম। বসুদেব কংসের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণকে ব্রজে নন্দের গৃহে রাখিয়া আসেন এবং নন্দের নবজাতা কন্যা যোগমায়াকে মাতা যশোদার অজ্ঞাতসারে কংসের কারা মধ্যে রাখিয়া আসেন।

শুকদেব ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা বলিতে লাগিলেন— পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত দৈত্য বধ ইত্যাদি নানা ঘটনার কথা

বলিলেন।

মহাতপ গর্গমুনি কর্ত্তৃক কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ সংস্কার হইল। ইনিই কৃষ্ণের নাম রাখিলেন 'বাসুদেব'। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখ মধ্যে যশোদাকে মৃদ্ ভক্ষণ দর্শন ছলে তাবৎ বিশ্বদর্শন করাইলেন।

যশোদা বালক শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই উদূখল সমেত দৌড়াইয়া উদূখলের আকর্ষণে দুইটি বৃহৎ অর্জ্জুন বৃক্ষ উৎপাটন করিয়াছিলেন। এই দুই বৃক্ষ পূর্ব্বে নলকুবের ও মনিগ্রীব নামে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। নারদের শাপে দুইজনই বৃক্ষ হইয়াছিল। তাঁহারা পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন।

গোকুলে (ব্রজে) নানা উৎপাত জনিত গোপগণ গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বকরাক্ষস বধ করিলেন। পূতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘ অসুরকে বধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের দেহমধ্যে প্রবেশহেতু অঘাসুর মুক্ত হইয়া গেল ও সে পরম গতি লাভ করিল।

ইহার পর পরীক্ষিত শুকদেবকে আত্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শুকদেব ব্রহ্মার মোহনাশের কথা বলিলেন। মায়া বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের অন্য এক মনোহর মহিমা দর্শন করিবার অভিলাষে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গো বৎস ও গোপ-বালক সকলকে পর্ব্বতের গুহাতে লুকাইয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বৎস ও বৎসপালকদের দেখিতে না পাইয়া ব্রহ্মার কর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বালকদিগের জননীদের এবং ব্রহ্মার সন্তোষ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত নিজেই বৎসগণ ও বৎসপালকদিগের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীহরি এইরূপে সর্ব্বরূপে প্রকাশ পাইয়া "সর্ব্বজগৎ বিশ্বময়" এই বাক্য

বস্তুতঃ সার্থক করিলেন। (দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় সকলেরই পাঠ করা উচিত।)

শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় তিনি ধেনুকাসুর বধ করিলেন ও কালিয়া নামক সর্পকে দমন করিলেন। এই সকল শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য ও মহিমার কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ দাবানলের প্রচণ্ড বহ্নি মুখ দ্বারা পান করিয়াছিলেন।

নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া বৃন্দাবনবাসী গোপ ও গোপিনিগণ মহানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

ইহাই গোপিনীদের সহিত লীলার আরম্ভ হইল। বালক কৃষ্ণের প্রেমলীলা অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

১০ খণ্ডের ২৯-৩৩ অধ্যায় 'রাসপঞ্চাধ্যায়'। ইহা অপূর্ব্ব। আমি লিখিলে ইহার মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। সকলেই ইহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ করিয়াই তৃপ্ত হইবেন। ইহাতে কামের লেশ মাত্র নাই, কারণ তখনও শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত বালক। এই সকল লীলা শ্রবণ করিলেও সমস্ত হৃদরোগ ধ্বংস হয়।

(ব্রজে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলা যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম দিলাম:—শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও দাসরঘুনাথ। ইহারা ব্রজে বাস করিয়া ব্রজে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাহার পর সুদর্শন নামক মহাসর্পকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে শাপমুক্ত করিলেন। শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া তাহার শিরোমনি বলরামকে দিলেন। অরিষ্টনামা অসুর ও কেশীদানবকে বধ করিলেন। ব্যোম-অসুরকে বধ করিলেন।

ইতিমধ্যে নারদ কংসকে গিয়া সব সত্য কথা বলিয়া দিলেন। কংস ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করিবার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করিলেন। অক্রূর পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন হইবে ভাবিয়া অক্রূর অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অক্রূর বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে সব কথা জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মথুরাভিমুখে শকটারোহণে চলিলেন। যমুনার জলে অক্রূর দেখিলেন অনন্তদেবের ক্রোড়ে পীতকৌষেয় বসন পরিহিত নানা চিহ্ন ও শস্ত্রাভরণে ভূষিত এক অপূর্ব্ব মুর্ত্তি—ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার স্তুতি করিতেছে। অক্রূর তাঁহার স্তব করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংস ধ্বংস করিলেন। নন্দ ও অন্যান্য গোপগণকে ব্রজে ফিরাইয়া দিলেন। তাহার পর গর্গমুনি কৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন সংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইলেন। তাঁহারা সান্দীপনি মুনির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়া স্বপুরে ফিরিলেন। কিন্তু ব্রজে আর ফিরিলেন না। উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া নন্দ, যশোদা ও গোপ-গোপিনিগণকে তাঁহার বিরহজনিত সন্তাপ দুর করিতে বলিলেন। উদ্ধব তাহাই করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনাইলেন।

কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ সতর বার মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন। প্রতিবারই পরাস্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

বার বার মথুরা অবরোধের কথা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রমধ্যে এক নগর প্রস্তুত করিলেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে সব যাদবগণকে সেখানে লইয়া গেলেন।

মান্ধাতা পুত্র মুচুকুন্দ দ্বারা কালযবন ভস্মীভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া যবন সৈন্যগণকে বধ করিলেন। প্রচুর ধনরত্নাদি লইয়া যাইতেছিলেন সেই সময় জরাসন্ধ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল ধনরত্নাদি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-বলরাম নবনির্ম্মিত পুরীতে প্রবেশ করিলেন।

বিদর্ভদেশের এক প্রধান রাজা ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্রের নাম প্রদ্যুম্ন। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাকেও বিবাহ করেন। তাহার পর পাণ্ডবদিগের সংবাদ লইবার জন্য সত্যভামাসহ কুরু প্রদেশে যান। সেখান হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে যান। এবং পরে স্বপুরে দ্বারকাতে ফিরিয়া আসেন।

শুকদেব সেই প্রসঙ্গে কৃকলাস ও নাগরাজার উপাখ্যান বলিলেন। নাগরাজ বহু পুণ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু একটি পাপ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে ঐ পাপের নিমিত্ত কৃকলাস হইয়া এক কূপে পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন, পুণ্যের দ্বারা পাপের ক্ষয় হয় না। পাপের ফল ও পুণ্যের ফল পৃথক পৃথক ভাবে ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি নাই।

শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব বলিলেন। কি করিয়া তিনি ১৬ হাজার পত্নী লইয়া বাস করিয়াছিলেন, নারদ যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন। (দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ আসিতে হইলে নিম্ন-লিখিত দেশ পার হইয়া যাইতে হইত—আনর্ত, সৌবিরমরু, কুরুক্ষেত্র, বহু গিরি, নদী, ব্রজ, গ্রাম, দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশ।)

যুধিষ্ঠির সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু জরাসন্ধকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ বেশে জরাসন্ধের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমরা বহুদূর হইতে আসিয়াছি, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।" তিনি রাজী হইলেন। তখন তাঁহারা নিজ নিজ পরিচয় দিলেন এবং দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন।

সেই যুদ্ধে ভীম জরাসন্ধকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। জরাসন্ধ বহু রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলকে উপদেশ দিলেন, তোমরা এই দেহকে মরণশীল জানিয়া আমার সেবা করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন কর।

রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রপূজ্য হইলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চেদিরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে নানারূপ নিন্দাবাক্য বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন। শিশুপাল আজীবন শ্রীহরির বৈর-চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তদ্দ্বারা কৃষ্ণচিত্তে সর্ব্বদা চিন্তা করতঃ শিশুপাল শ্রীহরির স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল। ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্তির কারণ।

রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন ব্যতীত সকলেই সুখী হইয়া স্ব-স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তাহার কিছুকাল পরে কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধে উভয় পক্ষের রাজগণই নিহত হইলেন। তাহাতে পৃথিবীর ভার হরণ হইল। বাকী সকল ঘটনাই সংক্ষেপে মহাভারতে দিয়াছি, কিভাবে যদু-বংশ ধ্বংস হইল।